পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

২২০৪ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই ; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচী

পূর্বকালের কথা

বাংলার জনবিন্যাসবৈচিত্র্য জানতে হলে তার আগে কিছু পুরোনো কথা জানা দরকার। বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার ক্ষেত্র এ নয়, সংক্ষেপে দুই-একটা কথার উল্লেখ করছি। বাংলা, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা তো অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ-বিভাগের আগেও যে বাংলা ছিল তা-ও আগেকার বাংলার চেয়ে অনেক ছোট। আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময় সুবে বাংলা কুড়িটি সরকারে বিভক্ত ছিল, যথা, উদম্বর বা ট্যাণ্ডা (রাজমহল, উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবীরভূম), জন্নতাবাদ ও লক্ষণাবতী (প্রধানতঃ মালদা), ফতেহাবাদ (ফরিদপুর, দক্ষিণবাখরগঞ্জ ও দ্বীপসমূহ), মামুদাবাদ (উত্তরনদীয়া, উত্তরযশোর, পশ্চিমফরিদপুর), খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোর ও পূর্ববাখরগঞ্জ), বাকলা (উত্তর ও পূর্ব বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ঢাকা) পূর্ণিয়া, তাজপুর (পূর্বপূর্ণিয়া এবং পশ্চিমদিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (দক্ষিণরংপুর, দক্ষিণপূর্ব দিনাজপুর ও রাজশাহী), পিঞ্জরা (দিনাজপুর এবং রাজশাহী ও রংপুরের বিভিন্ন অংশ), বরবকাবাদ (প্রধানতঃ রাজশাহী, দক্ষিণ-পশ্চিম বগুড়া ও দক্ষিণ-পূর্ব মালদা), বাজুহা (অংশতঃ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ঢাকা), সোনারগাঁও (পশ্চিম ত্রিপুরা ও নোয়াখালী), সিলেট, চট্টগ্রাম, শরিফাবাদ (প্রায়শঃ বর্ধমান) সুলেমানাবাদ (উত্তর হুগলী ও তৎসংলগ্ন নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের অংশ), সাতগাঁও (২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া), মন্দারণ (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিমহুগলি)। এছাড়া সরকার জলেশ্বরও তখন সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুর

ও উড়িষ্যা-অন্তর্গত জলেশ্বরের কিছু অংশ ছিল। এই বৃহৎ বিশাল বাংলার সকল অংশ উন্নতির সমান পর্যায়ে ছিল না। কোন্ অংশ কতখানি উন্নত ছিল এ নিয়ে গবেষণা করতে গেলে বহু গবেষণা করতে হয়। মোটের উপর বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় বনজঙ্গল কেটে চাষবাসের যে রকম প্রসার হয়েছিল এবং তার ফলে যতখানি ঘনবসতি হয়েছিল, পূর্ববাংলায় তা হয় নি। তবু মোগল আমলেও যে চাষবাসের প্রসারের জন্য অনেক জায়গাতেই আরও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল তার অনেক প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যেমন একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলি। সেকালে খাজনা আদায়ের যে মূল হার ছিল তার নাম ছিল পরগণা রেট। মোগল আমলে কয়েকবার খুব বড় সেটেলমেণ্ট হয়, তার মধ্যে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমলের সেটেলমেণ্ট প্রথম, তারপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুজা খান্-ই বন্দোবস্ত, তারপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জাফর খান-ই বা মুর্শিদকুলিখাঁর বন্দোবস্ত। এই সবগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পরগণা রেট বা মূল খাজনার হার বাড়ানো হত না। তাছাড়া গোড়ায় নিয়ম ছিল কোন জমি থেকেই জমিদার প্রজা উচ্ছেদ করতে পারবে না, যদি না সে জমি চাষের অন্য প্রজা পাওয়া যায়। এই সব হতে মনে হয়, সে সময় জনসংখ্যার চাপ এত বেশি হয়নি যাতে জমি নেবার জন্য প্রজাদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি আছে, প্রজার জন্য জমিদারদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবু প্রথম যুগের তুলনায় শেষের দিকে যে জমির আয় ও চাহিদা বেড়েছিল— সম্ভবতঃ লোকবৃদ্ধির ফলে— তার একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, শেষের যুগে পরগণা রেটের উপর আবওয়াব চাপিয়ে দেওয়ায়। আবওয়াব হল একালের সেস্-এর মত, বাড়তি খাজনা। শেষের দিকে মূল খাজনা যথাপূর্ব রেখে তার উপর এরকম আবওয়াব অনেক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা চাপানো সম্ভব হত না, যদি না অন্ততঃ কিছু পরিমাণে চাষবাস বাড়ত এবং আয় কিছু বাড়ত। আর সে যুগে লোকসংখ্যা না বাড়লে চাষবাস বাড়ার অন্য কোনও কারণ ছিল না, যেমন একালে আছে।

পূর্বেই বলেছি, এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে সর্বত্র সমানভাবে হচ্ছিল তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিশেষতঃ কিছুকাল থেকেই কতকগুলি খুব বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন হচ্ছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হল নদীপথের গতিপরিবর্তন এবং তার ফলে বাংলার প্রাকৃতিক বদল[১] এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বদল হচ্ছিল। এই প্রাকৃতিক বদলের মধ্যে সব চেয়ে বড় বদল হল নদীপথের গতি পরিবর্তন। প্রাচীন কালে গঙ্গার প্রধান খাত ছিল ভাগীরথী। তারপর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হতে (ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতাব্দী হতে) গঙ্গা ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখী হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভৈরব ইছামতী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী গঙ্গার জল বহন করতে করতে শেষে শাখার বর্তমান খাত হয়। দক্ষিণে একসময় আড়িয়ল খাঁ-ও কিছুদিন পদ্মার জল বহন করেছে। ওধারে ব্রহ্মপুত্রও কালে কালে গতিবদল করে শেষে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় পড়তে শুরু করেছে। এদিকে গঙ্গা ক্রমেই পূর্বগামিনী হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক নদী ক্ষীণকায়া হতে শুরু করে। এই ভাবেই মধ্য-দক্ষিণ বাংলার পতন হতে শুরু হয়। ভৈরব, ইছামতী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীর সে পূর্বগৌরব নেই; অধিকাংশই মরণোন্মুখ। সরস্বতী এককালে প্রকাণ্ড নদী ছিল, এখন তার চিহ্নও প্রায় নেই।

---

১ এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় *Changing face of Bengal.* এস্. সি. মজুমদারের *Rivers of the Bengal Delta*, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" তৃতীয় অধ্যায় এবং *West Bengal Census Report* 1951, *Part I-A*, *pp.* 15-18 পড়া উচিত।

দক্ষিণে আদিগঙ্গার খাত এককালে বড় ছিল। মহাভারতের বর্ণনা হতেও তার অনুমান বোধ হয় করা চলে। কিন্তু প্রাক্-ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে একালের বর্ণনা[২] পড়লেও দেখা যায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৫০০ খৃঃ আনুমানিক) কামারহাটি, আড়িয়াদহ, ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাট, বারুইপুর হয়ে চৌমুখী শতমুখী পার হয়ে চাঁদ সদাগর সাগর-সঙ্গমতীর্থে এসে পৌছলেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ সমূহেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তা হতে বোঝা যায়, নদীপথ এই দিকেই ছিল এবং সেই নদীর কূলে কূলে সমৃদ্ধ বন্দর নগর ও গঞ্জ ছিল। সুন্দরবনে প্রাপ্ত নানা মূর্তি, মাটির তলায় পাওয়া সুন্দরী কাঠ ইত্যাদি নানা প্রমাণ হতে বোঝা যায়, একসময় সেখানেও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সম্ভবতঃ মধ্যযুগে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই স্থান জনবসতি-হীন হয় এবং ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই পরিবর্তনের ফলে বাংলার জনবসতি জনবৈচিত্র্য এবং জনপদের অনেক পরিবর্তন ঘটে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেছেন, আর্যদের দেশবিজয় ঘটত নদীপথ ধরে ধরে— অনার্যেরা থাকত নদীর প্রধান গতিপথ হতে দূরে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে। সেখান হতে আর্য আগন্তুকেরা মাটির সন্তানদের বিতাড়িত করতে পারেন নি। জনগণনার পাতা ওল্‌টালে দেখা যাবে, একথা আজও সত্য। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবাস বড় নদীর ধারে ধারে যতটা, অন্যত্র তত নয়। পক্ষান্তরে তফশীলী জাতের বেশি বসতি সমুদ্র বা জঙ্গলের ধারে, পাহাড়ের উপরে। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবাংলায় তফশীলী জাতির জনসংখ্যা মোট ৪৬,৯৬,২০৫ ; তফশীলী ট্রাইবের জনসংখ্যা মোট ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। তার মধ্যে ২৪-পরগণাতেই ১০ লক্ষ ৫২ হাজার

২ বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৯৩।

তফশীলী জাতি, বর্ধমানে প্রায় ছয়লক্ষ, মেদিনীপুরে প্রায় পাঁচলক্ষ, বাঁকুড়ায় চারলক্ষ, হুগলীতে সওয়া তিন লক্ষ। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলা, যেমন মুর্শিদাবাদে প্রায় ২ লক্ষ মাত্র, নদীয়ায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার। তফশীলী জাতিরও সেই কথা। সর্বাধিক বেশি মেদিনীপুরে (২ লক্ষ ১২ হাজার), তারপর জলপাইগুড়ি (১ লক্ষ ৮৯ হাজার), তারপর বাঁকুড়া (১ লক্ষ ৩৮ হাজার) ইত্যাদি। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদে মাত্র ২৩ হাজার, নদীয়ায় প্রায় ১১ হাজার। গাঙ্গেয় সভ্যতা ও স্থানীয় সভ্যতার সংঘর্ষের চিহ্ন এখনও তার ছাপ বজায় রেখেছে। পক্ষান্তরে, তথাকথিত উঁচু জাতের কথা বলি। ১৯৫১ সালের এ হিসেব নেই, সুতরাং ১৯৩১ সালের হিসেব দিচ্ছি। সে সময় অবিভক্ত বাংলায় কায়স্থের মোট সংখ্যা ছিল মোটামুটি সাড়ে পনের লক্ষ। তার মধ্যে কলকাতায় কায়স্থের সংখ্যা খুব বেশি (১ লক্ষ ৬০ হাজার), কিন্তু ঢাকা ও ময়মনসিংহেও (যথাক্রমে দেড়লক্ষ ও ১ লক্ষ ৪৪ হাজার) কায়স্থের খুব ঘন বসতি। এ দুটি পদ্মা যমুনার দেশ সে কথা ভুলবার নয়। পক্ষান্তরে, অবিভক্ত বাংলায় নমশূদ্রের মোট সংখ্যা ছিল ২০.৯৪ লাখ, তার মধ্যে ফরিদপুরেই ৪.২৭ লাখ, বাখরগঞ্জে ৩.৫৫ লক্ষ, অথচ মুর্শিদাবাদে মাত্র ১১ হাজার। তেমনি পৌণ্ড্রদের মোট সংখ্যা ছিল ৬.৩৭ লক্ষ, তার মধ্যে শুধু চব্বিশপরগণাতেই ৩.৯৯ লক্ষ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সব জায়গাতেই প্যাটার্নমাফিক বসতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুগে যুগে বহু কারণ ঘটেছে, তার জন্য বসতি উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সেই প্রাচীন সংঘর্ষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে।

এ ছাড়াও উপরে উল্লিখিত প্রাকৃতিক অদলবদলের আরও কতকগুলি ফল ফলেছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, তার প্রধানতম ফল হল, প্রথমে

পশ্চিমবাংলার উন্নতি ও ঘনবসতি, পরে তার অবনতি ও পূর্ববাংলার বিকাশ ও জনবৃদ্ধি। মহাভারত বা অনুরূপ প্রাচীন গ্রন্থে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার উল্লেখ সময় সময় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ববাংলার বিশেষ উল্লেখ নেই। পরেকার যুগে বঙ্গ বা 'বাঙ্গাল' দেশের উল্লেখ যথেষ্ট আছে, ভাটি দেশেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু তখন নদীপথ পূর্বগামী হবার সময় প্রায় এগিয়ে এসেছে অথবা পূর্বগামিতা আরম্ভ হয়েছে। আকবরের সময় ইশা খাঁ আফ্‌গান ভাটি অঞ্চলের সামন্ত প্রভু ছিলেন। এই সময় আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায় পদ্মার নাম তখন পদ্মা রয়েছে, সেইটেই পুণ্যতোয়া গঙ্গা না হলেও বড়গঙ্গা। একটি কৃত্তিবাস-রামায়ণে কৃত্তিবাস নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন "ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা (বারেন্দ্রী) পার। যথাতথা কর‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার।" কিন্তু তা সত্ত্বেও— এমন কি বিক্রমপুরীর বৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্র সত্ত্বেও— ও অঞ্চলে তখন তত বেশি শহর বন্দর গঞ্জের নাম পাওয়া যায় না, যত এদিকে পাওয়া যায়। গৌড় হতে শুরু করে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত নদীর ধারে ধারে আশে পাশে অজস্র বন্দর শহর। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্-এর বর্ণনা হতে শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণের বর্ণনায়, এমন কি প্রথম ম্যাপ-আঁকিয়েদের ছবিতেও বঙ্গের পরিচয় নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত, হুগলী বরাহনগর বেতড়া। আরও আগে গঙ্গাময়ূরাক্ষীর জলোদ্যাত-উচ্ছল কর্ণসুবর্ণও (মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি)। এমন কি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আঁকা ফান্ডেন ব্রোকের নকশায় হুগলী খুব বড় শহর, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম তখনও বিদ্যমান। বারোস্-এর নকশায় আগড়পাড়া বরানগরের সগৌরব উল্লেখ আছে। আসলে তখন এই দিক্‌টারই খুব উন্নতি হয়েছিল।

তারপর এই অঞ্চলের অবনতি ঘটতে শুরু হল। তার প্রধান কারণ নদীবিপর্যয়। গৌড় সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির অবনতি ঘটার মূলে এ একটা মস্ত কারণ। আর একটা মস্ত কারণ নদীবিপর্যয়ের ফলে জলা এলাকার বৃদ্ধি ও অসুখ-বিসুখের প্রকোপ। শোনা যায় নাকি, প্রচণ্ড এক মহামারীর ফলেই গৌড় হতে রাজধানী টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু অতদিনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। মধ্যবাংলার নদী-বিপর্যয়ের ফলে মধ্যবাংলায় স্বাস্থ্যের অবনতি এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপবৃদ্ধি সর্বজনবিদিত। এর ফলে এই সব অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করল এবং পূর্ববঙ্গ সমৃদ্ধ হতে শুরু করল। এই পরিবর্তন সব চেয়ে বেশি ঘটেছে সপ্তদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এমন কি উনিশ শতকেও। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীর কতকগুলি থানায় ঘনবসতি ভয়ানক বেশি— বোধ হয় জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ। যেমন ঢাকার কেরানিগঞ্জ থানায় বর্গমাইলে ১৯৭৪ জন, দোহার থানায় ২০৪৯ জন, মুন্সীগঞ্জ থানায় ২৩২৯ জন, টাঙ্গিবাড়ি থানায় ৩০৪৪ জন, লোহাজং থানায় ৩২২৮ জন; ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানায় ১৫০২ জন, পালং থানায় ১৬৪০ জন। বরিশালের ঝালকাটিতে ১৫৬২ জন, বানরিপাড়ায় ১৬৯৮ জন। উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। অথচ এই সংখ্যাবৃদ্ধি অল্পকালের মধ্যেই খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে। মোগল আমলের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সে সময়, র‍্যালফ্ ফিচ (১৫৮৩-৯১ খৃঃ), ফন্‌সেকা (১৫৯৯ খৃঃ) ইত্যাদির বর্ণনায় পাওয়া যায় পূর্ববাংলার অনেক অনেক অংশই শ্বাপদসংকুল বনভূমি। রেনেলের নকশায় লেখা আছে বাখরগঞ্জের সমস্ত অঞ্চল মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন। কিন্তু তার পরের যুগের কথাই ধরছি। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন—

(১) যে অঞ্চলে আমন ধান হয় সেসব অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায়। তার উপর পাট হলে তো কথাই নেই।

(২) নতুন পলিমাটিপূর্ণ জমিতে আমন ধান ও পাট চাষের সুবিধা।

(৩) তার উপর সুপারি নারিকেল বাগান থাকলে আরও ঘনবসতি হয়।

পূর্ববঙ্গে এ তিনটিই আছে। তার উপর অজস্র সক্রিয় নদী ও খাল থাকায় স্বাস্থ্যের অবনতিও হয় নি। এই সব কারণে স্বতঃই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।

ইংরেজ আমলের ইতিহাস

ইংরেজ আমলের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে।

প্রসিদ্ধ জনসংখ্যাবিৎ কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তত্ত্ব আলোচনা করে বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীর আগে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা বিশেষ ধারা ছিল। জনসংখ্যা একবার বেড়েছে, একবার কমেছে। গত শতাব্দীর গোটাটাই মোটামুটি এইরকমভাবে চলেছে। এইরকম ঢেউ-এর ওঠাপড়ায় চলতে চলতে এই শতাব্দীতে পৌছে গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু একটা ব্যাপার ঘটল যার ফলে জনসংখ্যা আর কমতির দিকে গেলই না— কেবলই বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে লক্ষ্য করবার কথা, সেই বাড়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে হতে লাগল। মোগল আমলে যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা হতে অনুমান করা বোধহয় অন্যায় নয় যে সে সময় জনসংখ্যা বাড়ছিল বটে, কিন্তু খুব ধীরগতিতে বাড়ছিল। কিন্তু একালে জনসংখ্যা বাড়বার গতি সে তুলনায় অনেক দ্রুত।

কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই বিশেষ প্যাটার্নটির দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেকথা বাংলাদেশের পক্ষে এক হিসেবে খাটে, এক হিসেবে খাটে না। তার কারণ পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলায় একধরনের বিকাশ হয় নি। প্রথম পূর্ববাংলার কথাই বলি। আগেই বলেছি, পূর্ববাংলার বিকাশ হতে আরম্ভ হয় অনেক দেরিতে, কিন্তু যখন হতে আরম্ভ হল তখন তা অব্যাহতভাবে জোরের সঙ্গেই হতে আরম্ভ হল। বিশেষতঃ, ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খৃঃ) মন্বন্তরের ধাক্কা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবাংলাতেই এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে পূর্ণিয়া ইত্যাদি জেলায়। পূর্ববাংলায় তার ধাক্কা তেমন পৌছয় নি।

বর্ধমান ফীভার বা ম্যালেরিয়ার মহামারী (১৮৬৪ সাল) পশ্চিম ও মধ্যবাংলাকে যেমন ধ্বংস করেছিল পূর্ববাংলাকে তেমন নয়।[৩] যখন অন্যত্র লোক বাড়ছে সে সময়ও যশোর জেলায় ১৮৮১ সাল হতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লোক কেবলই কমে এসেছে। এরকম ঘটনা পূর্ববঙ্গে ঘটেনি। সেইজন্য সেখানে জনবৃদ্ধি অনেক বেশি অব্যাহত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ বিকাশের পথে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। প্রথম সেস্ ভ্যালুয়েশনের কাগজপত্রে তার একটা ইঙ্গিত ছড়ানো আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সেস বসে; তারপর কয়েকবছর ধরে সেস্ ভ্যালুয়েশন হয়। তাতে পরপৃষ্ঠায় লিখিত হিসেব পাওয়া যায়[৪]—

এ হতে অনেকগুলি কৌতূহলকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ ছোট আকারের জমিদারী পূবে অনেক বেশি (এক লক্ষ তিন হাজার) পশ্চিমে অনেক কম (তের হাজার পাঁচশ মাত্র)। এ হতে বোঝা যায় বড় জমিদারীর উদ্ভব পূর্ব বাংলায় তখনও হয় নি। তখনও সেখানে বড় চাষীই বেশি। উপস্বত্বভোগী পশ্চিমবঙ্গের মত বেশি হয় নি। কাজেই বড় চাষীদের সঙ্গে সরকারী বন্দোবস্ত হবার ফলেই একশ' টাকা বা তার চেয়ে কম রেভিনিউ দেয় এমন জমিদারীর সংখ্যা পূর্ববঙ্গে অনেক

---

৩ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের *The Changing Face of Bengal* বইটির ৮১ পৃষ্ঠায় কতকগুলি Spleen-index দেওয়া আছে। তা হতে দেখা যায়, যেসব জায়গায় প্লীহা-index বেশি সেখানেই কৃষি ও জনসংখ্যার ক্ষয় ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Spleen-index খুব নীচু :—কালনা, ৮৮ ; রাণাঘাট ৭৫ , কৃষ্ণনগর ৭৩ ; বনগাঁ ৭১ ; মেহেরপুর ৭০ ; বর্ধমান ৭০ ; চুয়াডাঙ্গা ৫৭ ; ঝিনাইদহ ৫৭ ; নাটোর ৫৩ ; পাবনা ৬৫ ; রাজশাহী ৫৭ , মাওরা ৫১ ; মুর্শিদাবাদ ৫০। পক্ষান্তরে, ফরিদপুর ২০ ; সিরাজগঞ্জ ১৮ : ঢাকা ১৩ ; গোপালগঞ্জ ৮ ; মৈমনসিংহ ৭ ; মাদারিপুর ২ ; মুন্সীগঞ্জ ১ ; নারায়ণগঞ্জ ১ ; নোয়াখালি ১।

৪ *Zemindari Settlement of Bengal*, (1879), Vol. 1. p 288 দ্রষ্টব্য।

১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত সমস্ত জমিদারী স্বত্ব মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বের ভ্যালুয়েশন (প্রজাই স্বত্ব বাদে)।

	ভ্যালুয়েশন-কৃত এস্টেটের সংখ্যা		ভ্যালুয়েশন-কৃত মধ্যস্বত্বের সংখ্যা		মোট সংখ্যা		ভ্যালুয়েশন		জেলার রেভিনিউ
	রেভিনিউ দেয়		খাজনা দেয়		এস্টেট	মধ্যস্বত্ব	এস্টেটের	মধ্যস্বত্বের	
	১০০ টাকার উপর	১০০ টাকা ও তার কম	১০০ টাকার উপর	১০০ টাকা ও তার কম			টাকা	টাকা	টাকা
বাংলা—									
১। পূবের জেলাগুলি (কেবল ঢাকা বিভাগ)	৪,৮৭০	১,০৩,২৫৯	২১,৯২৬	৫,৩১,৫৭৩	১,০৮,১২৯	৫,৫৩,৫০৪	২,৫৫,৪৮,৭৫০	২,০৯,৪৬,১৩১	৫১,০২,৯১৬
২। পশ্চিমের জেলাগুলি	৪,৫৭৩	১৩,৫৯৬	১০,০৭৯	১,৪৩,২০১	১৮,১৬৯	১,৫৩,২৬০	১,৮৪,৯০,৬২৫	১,২০,৮৪,৯০১	৭৭,৩৩,৫১৭
৩। মধ্যবাংলার জেলাগুলি	৬,১৮৭	১৭,৪০৩	২০,৪৭৬	১,৭০,৯১০	২৩,৫৯০	১,৯১,৩৮৬	২,৯৬,৩৫,৩৫৩	১,৭৭,০৩,৫৮১	৯৮,৯৬,৮৪০
মোট	১৫,৬৩০	১,৩৪,২৫৮	৫২,৪৬১	৮,৪৫,৬৮৯	১,৪৯,৮৮৮	৮,৯৮,১৫০	৭,৩৬,৭৪,৭২৮	৫,০৭,৩৪,৬১৩	২,২৭,৩৩,২৭৩

বেশি। প্রজা স্বত্বের বেলাতেও সেই কথা। অবশ্য এ হতে হঠাৎ মনে হতে পারে, পূর্ববঙ্গে ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা পাঁচলাখ একত্রিশ হাজার আর পশ্চিমবঙ্গে তো মোটে একলাখ তেতাল্লিশ হাজার, তাহলে তো পূর্ব বাংলাতেই ঘনতা বেশি। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। তার দুটি প্রমাণ আছে। ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা দিয়ে ছোট মধ্যস্বত্বের ভ্যালুয়েশনকে ভাগ করলে দেখা যাবে, পূর্ববাংলায় প্রতি ছোট মধ্যস্বত্বের গড়পড়তা ভ্যালুয়েশন, ৩৯·৪ টাকা— মোটামুটি ৪০ টাকা। আর সে-ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ভ্যালুয়েশন ৮২ টাকা— ডবলেরও বেশি। পূর্ববাংলায় মোট ১,০৮,১২৯টি জমিদারীর তলায় ৫,৫০৪টি মধ্যস্বত্ব ছিল, অর্থাৎ গড়ে প্রতি জমিদারীতে মেটামুটি ৫টি মধ্যস্বত্ব। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হিসেব হচ্ছে প্রতিটি জমিদারীতে ৮·৮ টি মধ্যস্বত্ব। অনেক বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বত্বের মূল্যও অনেক বেশি, জমিদারী-প্রতি মধ্যস্বত্বের সংখ্যাও অনেক বেশি। জমির চাষ হতে হতে চাপ বেড়ে বেড়ে প্রান্তিক সীমানায় পৌছবার লক্ষণ এইগুলি, জনাধিক্যেরও। এই হতে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলার একটা তফাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে সুন্দরবনে, বিশেষতঃ পশ্চিম সুন্দরবনে, (বাখরগঞ্জে জঙ্গল এখনও ঢের বেশি) জঙ্গল কেটে আবাদ করাবার চেষ্টা এই সময়ই সরকার হতে শুরু হয়েছিল। বাখরগঞ্জ খুলনার তুলনায় সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণাতেই সুন্দরবন সব চেয়ে সংকুচিত। এর মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু তার পরের অবস্থাটা দেখা যাক। ১৯৩১ সালের অবিভক্ত বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট (৬৬ পৃষ্ঠা) হতে একটি হিসাব তুলে দিচ্ছি—

ডিভিসন বা বিভাগ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা							ঐ সময় জনসংখ্যার শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি (বৃদ্ধি+, হ্রাস—)						
	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-৯১	১৮৭২-৮১	১৮৭২-১৯৩১
অবিভক্ত বাংলা	৬১৬	৫৭৮	৫৬৩	৫২১	৪৮৪	৪৫০	৪২২	+৭·৩	+২·৮	+৮·০	+৭·৭	+৭·৫	+৬·৭	+৪৭·২৫
তার মধ্যে—														
বর্ধমান বিভাগ	৬১৮	৫৮১	৬১১	৫৯৫	৫৫৫	৫৩৪	৫৪৫	+৭·৪	−৪·৯	+২·৮	+৭·২	+৪·০	−২·৮	+১৩·৭১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৬৬	৫৪৩	৫৪১	৫১৫	৪৮৯	৪৭০	৪২৫	+৭·০	+০.৪	+৫·১	+৫·৪	+৩·৯	+১০·৫	+৩৬·৪
রাজশাহী বিভাগ	৫৫৭	৫৪৩	৫৩৩	৪৯৩	৪৬৪	৪৪৩	৪২৩	+২·৭	+২·০	+৮·২	+৬·২	+৪·৭	+৪·৮	+৩২·৪
ঢাকা বিভাগ	৯৩৫	৮৬৬	৮০৯	৭২৬	৬৬২	৫৮৬	৫১১	+৮·২	+৭·১	+১১·৪	+৯·৬	+১৩·০	+১৪·৬	+৮৩·৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৩৪	৫১২	৪৬৭	৪১০	৩৬৩	৩০৯	২৯৮	+১৩·৭	+৯·৮	+১৩·৮	+১৩·০	+১৭·৪	+৩·৮	+৯৫·৮

বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনা করলেই তফাৎটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ধমান বিভাগে ১৮৭২-১৯৩১ এই উনষাট বছরে জনসংখ্যা অন্ততঃ দুবার কমেছে, বাকী সময় বেড়েছে বটে, কিন্তু তা-ও অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে। এই সময় মোট শতকরা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৩.৭১ ভাগ, বসতি বেড়েছে প্রতি বর্গমাইলে ৫৪৫ হতে ৬১৮। ১৯২১ সালে তো মাত্র ৫৮১, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে বর্গমাইলে মাত্র ৩৬ জন। তার সঙ্গে ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগ তুলনা করুন। উনষাট বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮৩·৩ ভাগ এবং ৯৫·৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। বসতিও বেড়েছে, ঢাকায় ৫১১ হতে ৯৩৫! চট্টগ্রামে বসতি এখনও তত হয়নি বটে, কিন্তু কি দ্রুত বৃদ্ধি! ২৯৮ হতে একেবারে ৫৩৪!

এবার পশ্চিম বাংলার কথায় আসা যাক। পূর্বের আলোচনা হতেই আভাস পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলায় জনবৃদ্ধির ধারা কি। সংক্ষেপে দু একটি কথার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। হাণ্টার সাহেবের মতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল, বাংলার কৃষিজীবীদের অর্ধেক। অবশ্য মনে রাখতে হবে এ বাংলা আর প্রাক্-র্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ বাংলার এলাকা এক নয়। সে সময় বাংলা আরও বড় ছিল। তার কয়েক বছর পর কোলব্রুক সাহেব জনসংখ্যার একটা আন্দাজ করেন। তখন বাংলা ও বিহারের মোট এলাকা ছিল ১৪৯, ২১৭ বর্গ মাইল ; বেনারেস সমেত ১৬২, ৫০০ বর্গমাইল। তখন ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে কোলব্রুক নিম্নলিখিত হিসেব দিয়েছেন —

	অনুপাত
নদী, খাল, বিল, (১/৮ মাংশ) :—	৩
গ্রাম ও শহরের বাস্তু, রাস্তা,	
পুকুর ইত্যাদি (১/২৪ অংশ) :—	১
চাষের অযোগ্য (১/৬ অংশ) :—	৪
নিষ্কর জমি (১/৮) :—	৩
স-কর জমি	
চাষে ব্যবহৃত (৩/৮) :—	৯
পতিত (১/৬) :—	৪
	২৪ = ১০০%

কোলব্রুক বলছেন দেওয়ানি বাংলায় তখন প্রতি বর্গমাইলে ২০৩ জন লোক ছিল, মোট জনসংখ্যা ৩,০২,৯১,০৫১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩ কোটি। কোলব্রুক আরও বলছেন সব চেয়ে সমৃদ্ধ জেলা হল বর্ধমান, ২৪ পরগনা ও নদীয়া, আর সব চেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা হল সিলেট, কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং রামগড়।

তারপর আর একজন পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ডাঃ বুকানন-হ্যামিল্টন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে দক্ষিণভারত ও উত্তরভারতের বহু জায়গার তথ্য সংগ্রহ করে-ছিলেন। তার মধ্যে ১৮০৮ সালের দিনাজপুরের বর্ণনা আছে। তিনি যে সমস্ত হিসেব দিয়েছিলেন তা হতে তখনকার অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। যেমন সে সময় দিনাজপুর জেলায় বাড়ী ও বাগান বাদ দিয়ে ৭,১৯,৪০০ বিঘা জমি ছিল। তার মধ্যে মোটামুটি ১৯৪০০ বিঘা ছিল জমিদারের খাস। বাকি ৭ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ বিঘা ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে। বাকী ৬,৬০,০০০ বিঘার হিসেব এই রকম:—

গড়পড়তা মাথা পিছু চাষের জমি ১৬৫ বিঘা, এরকম ৬৬০০ চাষী ; মাথা পিছু ৭৫ বিঘা জমি এরকম ৮৮০০ চাষী ; ৬০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১১০০০ চাষী ; ৪৫ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১৯৮০০ চাষী ; ৩০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ৫৫ হাজার চাষী ; ১৫ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১,১০,০০০ চাষী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তখন কতকগুলি জায়গায় যথেষ্ট ঘন বসতি (কোলব্রুকের মতে), অথচ কতকগুলি জায়গায় তত নয় (যেমন দিনাজপুরে)। ২০৩ জন গড়পড়তা লোক প্রতি বর্গ মাইলে, এ বড় কম ঘনতা নয়। তার উপর কতকগুলি জায়গায় যদি তার মধ্যেই হাল্‌কা বসতি থাকে, তার অর্থই হল অন্য জায়গাগুলিতে আরও ঘন বসতি। খাস পশ্চিম বাংলায় ঘনবসতি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেই এই অবস্থা।

ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং উনিশ শতকের ত্রি-চতুর্থ অংশেরই জনসংখ্যার মাথাগুনতি হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সময়ের জনসমুদ্রের জোয়ারভাটার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেকালের ভূমিব্যবস্থার অদলবদল হতে। তা হতে বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়। বস্তুত সেকালের ভূমি-আইনের অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে কোনও গবেষণাই সাধারণতঃ হয় না, তা হলে বাংলার সে সময়কার অজানা কথা অনেক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু সংক্ষেপে দু একটা কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই যুগে ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি বড় যুগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; তারপর ১৮৫৯ সালের রেণ্ট অ্যাক্ট, সেই সঙ্গে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রেট রেণ্ট কেস ; তারপর ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই প্রায় একশ বছরে চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে

এল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিকানা সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছিল জমিদারদের হাতে এই আশায় যে তাঁরা চাষের বিস্তার (কথাটি লক্ষণীয়) ও চাষীর উন্নতি করবেন। একশ বছরে দেখা গেল তাঁরা তা করেন নি, কেবলই অনুপার্জিত আয় আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে অধিকার দেওয়া হল প্রজাদের হাতে। এখন দেখা যাচ্ছে তারাও তা করে নি। সেইজন্য কিছুকাল হতেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে প্রজাদের তলায় যে সব ছোট প্রজা বা বর্গাদার আছে তাদের হাতে ক্ষমতা এবং অধিকার দেবার। কিন্তু সে কথা যাক্। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অবধি ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে একটি জিনিস খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সেটি হল, প্রথম যুগে চাষ বেশি ছিল না; সেইজন্য জমিদারদেরই দরকার হত প্রজার। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা উল্‌টে গেল। তখন প্রজারাই জমির জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। জমিসংক্রান্ত আইনে তারই ছাপ পড়েছে। দু একটা প্রমাণ দিচ্ছি।

আইন-ই-আকবরিতে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে আমলগুজার বা রেভিনিউ কালেক্টরেরা প্রতি বছরে চাষীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন এবং দীর্ঘ কিস্তিতে আস্তে আস্তে তার শোধ নেবেন। তার উপরে মোগল আমলের পরগণা রেট এবং অন্য চাষী না পেলে কোনও জমি হতে চাষী উচ্ছেদের নিষেধ— এ সমস্ত হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে চাষের লোকের অভাব ছিল, অন্ততঃ সংখ্যাধিক্য ছিল না। তার উপর খোদকস্ত প্রজাদের মর্যাদাও লক্ষণীয়। শেষের দিকে এ অবস্থার বদল ঘটেছিল তারও কিছু কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আবওয়াবের ক্রমিক বৃদ্ধি। সবসময় প্রজাদের দেবার ক্ষমতা দেখে কর ধার্য হত এমন নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে মোটের উপর কিছুটা সঞ্চয় বৃদ্ধি না হলে ঐ রকম পর পর আবওয়াব বসানো সম্ভব ছিল না। কৃষির প্রসারই ছিল

সে যুগের সঞ্চয়বৃদ্ধির প্রধান উপায়। আর মোগল আমলের শেষের দিকে জনবসতিও যে পশ্চিমবাংলায় অনেকখানি ঘন ছিল তার প্রমাণও আছে। কোলব্রুকই তো বলেছেন, মন্বন্তরের পরও বর্গমাইলে ঘনতা ছিল ২০৩ জন। কিন্তু এসবই বদলে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর। তখনকার কর্তৃপক্ষের মতে মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায় (প্রায় এক কোটি) অর্থাৎ মোট কৃষিজীবীদের অর্ধেক। চাষের জমিও অর্ধেক অনাবাদি হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম কারণও এই। হেস্টিংস ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও খাজনা বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন নি, কিন্তু পরে তাঁর মত লোককেও থমকে দাঁড়াতে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ইঙ্গিত আসে হেস্টিংসের কাছ থেকেই[৫]; ফ্রান্সিসও তাই বলেন। কর্নওয়ালিশ এসে দেখলেন, বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল ও অনাবাদি হয়ে রয়েছে। ততদিনে শিল্পও ধ্বংসপ্রায়, কাজেই জমি হতে আয় না বাড়লে কোম্পানীরও চলে না, লোকদের তো নয়ই। কর্ণওয়ালিশ এক ঢিলে অনেক পাখি মারবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল, বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করে দিলে কোম্পানীরও একটা বাঁধা আয় রইল (সে সময় আয়ের তুলনায় রাজস্ব খুব চড়া হারেই স্থির করেছিলেন কর্ণওয়ালিশ), জমিদারেরা চাষের বিস্তার করে লাভবান হবারও চেষ্টা করবে, কোম্পানীকে আর প্রজাশোষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হবে না, উপরন্তু ইংরেজের সহায়ক একটা রাজনৈতিক শ্রেণীত্ব গড়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লোকের অভাব এবং অনাবাদি জমির প্রাচুর্যের উপর ঝোঁকটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল হফতম পঞ্চম রেগুলেশন। উনিশ শতকের প্রথমপাদে এই দুইটি রেগুলেশন পাশ হয়েছিল। ও দুটির মোদ্দা কথা

৫ রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India*, Vol I দ্রষ্টব্য।

হল, জমিদারের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রজা অন্য কোনও জমিদারের জমি চাষ করতে যেতে পারবে না, প্রজাদের জোর করে কাজ করাতেও জমিদারেরা পারবেন, দরকার হলে প্রজাদের আটকে রেখেও দিতে পারবেন। সে সময়কার কাগজপত্রে আরও দেখা যায় এক জমিদার অন্য জমিদারের প্রজা ভাড়িয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং তাই নিয়ে মামলা মোকর্দমা নালিশ ফরিয়াদ চলছে। এই সব হতে বোঝা যায় তখন প্রয়োজনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম।

কিন্তু গত শতকের মাঝামাঝি দেখা যায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরও কয়েকজন বলছেন[৬]

> There is an almost universal absence of good feeling between landlord and tenant...the new sale law (Act I of 1845) grants to landlords the powers of enhancing withoutlimit the rents of all tenants except the khoodkast and some others of a rare description, situated in estates purchased at a sale for arrears of revenue due to them. The removal of a khookast tenant is therefore a great advantage to the landlord whenever the holding, as it must often be, is more highly bid for by a new-comer.

এ হতেই বোঝা যায়, অবস্থা সম্পূর্ণ বদলেছে। আগে লোকাভাবের জন্য জমিদারদেরই প্রজা খুঁজে বেড়াতে হত; এখন লোকের আধিক্য হেতু প্রজারাই জমি খুঁজে বেড়ায়। আগে জমিদারদের চেষ্টা ছিল প্রজা যেন না পালায়, কেন না তাহলে জমি পড়ে থাকবে; এখন

৬ Zemindari Settlement of Bengal, Vol I, p 59.

জমিদারদের চেষ্টাই হল প্রজা উচ্ছেদ করবার, কারণ তা হলেই আরও বেশি টাকা দিয়ে জমি নেবার লোক পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ ১৮৫৯ সালের রেণ্টঅ্যাক্ট এবং ১৮৬৫ সালের গ্রেট রেণ্ট কেস্-এর অর্থ নৈতিক তাৎপর্যও এ ছাড়া আর কিছু নয়। যে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় প্রজাদের হাতে এসেছে তার কতখানি কিভাবে জমিদারেরা নিয়ে নিতে পারে তাই নিয়েই ঐ সব আইন এবং মামলা। তার উপর রায়তি স্থিতিবান্ স্বত্বের প্রতিষ্ঠা সেই পুরোনো খোদকস্ত প্রজারই অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নামান্তর। তা ছাড়া আরও মনে রাখতে হবে, (১) হফতম পঞ্চম রেগুলেশন-এর বহুকাল আগেই উঠে গিয়েছে ; (২) প্রজাদের হাতের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় কেড়ে নেবার জন্যই আইন হচ্ছে (৩) বাঁকুড়া প্রভৃতি অনুর্বর জেলা থেকে এই সময়েই আসামে কুলি চালান শুরু হয়েছে বলে হাণ্টার লিখেছেন ; (৪) এই সময় হুগলী প্রভৃতি কতকগুলি জেলায় প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোকের বাস ছিল ; (৫) সুন্দরবনে আবাদ করবার চেষ্টা সরকার শুরু করেছেন। এইসব হতে দেখা যায় তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব তো কেটে গিয়েছেই, উপরন্তু যথেষ্ট লোকবৃদ্ধি হয়েছে। আমার ধারণা, ১৮২৫-৩৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোকক্ষয় কেটে গিয়ে পুরানো অবস্থা ফিরে আসে, তারপর আবার লোকবৃদ্ধি শুরু হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের সেন্সাস কর্তৃপক্ষ লিখেছেন,[৭] ভারতবর্ষে বা বাংলায় এইযুগে লোকসমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধির কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। তা একবার বেড়েছে আর একবার কমেছে। কিন্তু ১৯২০ সালের পর এরকম ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, জনসংখ্যা কেবল বাড়তেই

[৭] *Census of India, 1951, vol VI. Part IA, West Bengal, Sikkim and Chandernagar* p. 369.

লাগল। এ সম্বন্ধে সেন্‌সাস কর্তৃপক্ষ কতকগুলি কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁরা বলছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঠিক একশ বছর পরেও প্রতি জেলায় অকর্ষিত ভূমি অনেক ছিল। আরও আশি বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৫০ সালে, দেখা যাচ্ছে লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ছাড়া আর প্রায় কিছুই পতিত জমি নেই। তার কারণ, আগে জনবৃদ্ধি ও হ্রাস পরপর চলছিল। এর কারণ খুঁজতে হয়, দুর্ভিক্ষে, ম্যালেরিয়ায়, রেলের বাঁধ হবার ফলে জলনিকাশ রোধ হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতিতে, হৃতবল ক্ষীণশক্তি জনসাধারণের রোগ-আক্রমণ-প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলায়। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরে ক্রমান্বয়ে লোকবৃদ্ধিরও কতকগুলি কারণ আছে। সেন্‌সাস কর্তৃপক্ষের মতে এর অন্যতম কারণ হল, যাতায়াতের সুবিধা বিস্তারের জন্য এ পর্যন্ত দুরধিগম্য স্থানে যাওয়ার সুবিধা এবং সেইকারণে সংক্রামক ব্যধি ও খাদ্যভাব নিরোধের অধিকতর সুব্যবস্থা। দ্বিতীয় কারণ হল, কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হবার ফলে কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আর্থিক উন্নতি। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকেরাও এখন দ্রুত অন্যত্র চলে যেতে পারছে এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। তা ছাড়া ১৯৪৩ সাল ছাড়া কোনও মহামারী বা দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে হয় নি। জনস্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমছে। তার উপরও বাংলায় বহিরাগতের সংখ্যা যথেষ্ট। বহিরাগতের আগমনে বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই সব নানা কারণের ফলে জনসংখ্যা এখন অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলেছে। আরও যত অবস্থার উন্নতি হবে, মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকবে, জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে— এবং বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে— ততই আমাদের জনসমষ্টি বেড়ে চলবে।

পূর্বে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ১৮৭২ সাল হতে কিরকম বেড়েছিল বা কমেছিল তার হিসেব দিয়েছি। এখন বর্তমান পশ্চিমবাংলার হিসেব ধরা যাক্। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। পশ্চিমবাংলায় বাইরে থেকে লোক সমাগম সাধারণতঃ একটু বেশি। সেইজন্য জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি আলোচনা করবার সময় বহিরাগত ও বহির্গতদের হিসেব আলাদা না ধরলে পশ্চিমবাংলার সত্যকার "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা কতখানি বাড়ল বা কমল তা ধরা যাবে না। সেইজন্য পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা এবং স্বাভাবিক লোকসংখ্যা উভয়েরই হিসেব তুলে দিচ্ছি[৮] —

এর মধ্যে ১৯৪১ সালের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় পূর্বে এক এক সময় জনসংখ্যা বেড়েছে এক এক সময় কমেছে। কিন্তু ১৯২১ সালের পর তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

বস্তুত পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিকে কয়েকটা সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। আমি অন্যত্র এই ভাগ দেখাবার চেষ্টা করেছি।[৯] তার মধ্যে প্রথম ভাগ হল ১৭৭০ হতে ১৮৭০। এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। প্রথম পর্ব ১৮২৫।৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ধাক্কা কাটে নি। তারপর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির শুরু। দ্বিতীয় ভাগ হল মোটামুটি ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। তার প্রধান লক্ষণ হল লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের শুরু, জমিতে লোকাধিক্য, কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার সন্ধান ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এক একবার লোকক্ষয়। তৃতীয় ভাগ হল ১৯১৪ হতে ১৯৪৬। এই যুগের

---

৮ পাদটীকা ৭ দ্রঃ, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

৯ *Census of India, 1951, vol vi part I C, West Bengal, Sikkim Chandernagar, pp 297—304*

পশ্চিমবাংলার মোট ও "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা, ১৮৯১-১৯৫১

(১৯৪১ সালের জনসংখ্যা সংশোধিত)

	১৯৫১	১৯৪১ (সংশোধিত)	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
১। মোট সংখ্যা	২,৪৮,১০,৩০৮	২,০৭,৫৬,৬৮২	১,৭৬,৬৩,৪২৭	১,৬৪,০০৮৩৭	১,৬৭,৯২,৮০০	১,৫৮,৩৪,০১০	১,৪৬,৪৯,৮৫০
২। বহিরাগত	৪৬,০০,৬৭২	১৭,২৯,৮২০	১৪,৭৭,৯০৫	১৪,৬০,০৫৪	১৪,২৮,০৭৫	১০,৪৫,৩১৪	৬,৮৭,৬৬২
৩। বহির্গত	৩,১১,১১৬	১,৮৫,৭৫৩	১,৫৫,৭৮১	১,৯১,২০০	২,৬২,০১০	৬৬,১২১	১,০১,৩০৫
৪। নীট্ বা "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা	২,০৫,২০,৭৫২	১,৯২,১২,৬১৫	১,৬৩,৪১,৩০৩	১,৫১,৩১,৯৮৩	১,৫৬,২৬,৭৩৫	১,৪৮,৫৪,৮১৭	১,৪০,৬৩,৪৯৩
৫। শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+৬·৮	+১৭·৬	+৮·০	−৩·২	+৫·২	+৫·৬	...

প্রধানতম লক্ষণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অবশ্য এর মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হয়েছে, তার জন্য লোকক্ষয়ও হয়েছে। কিন্তু গোটা যুগটাকে সমগ্রভাবে দেখলে দেখা যাবে লোকসংখ্যা বেড়েছেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে সাময়িক উন্নতি হলেও মোটের উপর ক্ষয় হয়েছে। শেষ যুগ হল ১৯৪৬ হতে ১৯৫৫। লোকসংখ্যা ও ক্ষয়িষ্ণুতা উভয়েরই চরম বৃদ্ধি। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে পশ্চিমবাংলার বর্তমান জনসমষ্টির চেহারাটা জানা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব

১৯৫১ সালের জনগণনায় বর্তমান পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার হিসেব এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের অনুরূপ হিসেব তুলে দিচ্ছি :—

	এলাকা (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
আসাম	৮৫,০১২	৯০,৪৩,৭০৭	১০৬
বিহার	৭০,৩৩০	৪,০২,২৫,৯৪৭	৫৭২
বোম্বাই	১,১১,৪৩৪	৩,৫৯,৫৬,১৫০	৩২৩
মাদ্রাজ (অবিভক্ত)	১,২৭,৭৯০	৫,৭০,১৬,০০২	৪৪৬
মধ্যপ্রদেশ	১,৩০,২৭২	২,১২,৪৭,৫৩৩	১৬৩
মহীশূর	২৯,৪৮৯	৯০,৭৪,৯৭২	৩০৮
পঞ্জাব	৩৭,৩৭৮	১,২৬,৪১,২০৫	৩৩৮
উড়িষ্যা	৬০,১৩৬	১,৪৬,৪৫,৯৪৬	২৪৪
উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪০৯	৬,৩২,১৫,৭৪২	৫৫৭
পশ্চিমবাংলা	৩০,৭৭৫	২,৪৮,১০,৩০৮	৭৯৯

দেখা যাচ্ছে, আয়তনে 'ক' রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবাংলাই সব চেয়ে ছোট— এমন কি দ্বিধাবিভক্ত পঞ্জাবের চেয়েও তার আয়তন কম। অথচ তার জনসংখ্যা খুব বেশি। সেইজন্য তার বর্গমাইলে জনবসতি 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। বিহারে তা মাত্র ৫৭২, উত্তরপ্রদেশে ৫৫৭, বোম্বাইয়ে ৩২৩, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তা ৭৯৯। অন্যগুলির তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এই প্রসঙ্গে সেন্‌সাসে কতকগুলি কৌতুকাবহ তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তুলে দিচ্ছি :—[১০]

---

১০ "আমার দেশ", শ্রীঅশোক মিত্র প্রণীত, ৩২ পৃষ্ঠা।

(১) 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ও মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম।

(২) লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম ও আসামের স্থান নবম।

(৩) বসতির ঘনতা, ঐ শ্রেণীর রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক, আসামে সর্বাপেক্ষা কম।

(৪) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পতম, উড়িষ্যায় বৃহত্তম।

(৫) এই রাজ্যের জনসমষ্টির শতকরা ৩·১ ভাগ লোক পারিবারিক জীবন যাপন করে না।

(৬) পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু লোকসংখ্যা গড়ে ৪·৯ জন।

(৭) পশ্চিমবাংলায় দশ বছরে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিম্নতম।

(৮) জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ শহরবাসী।

(৯) অকৃষিজীবীর হার এখানে সর্বোচ্চ।

(১০) রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ লোক লিখতে পড়তে সক্ষম। এইটিই 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের সর্বোচ্য হার।

(১১) পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর চাপ সর্বাধিক। প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু।

জনবসতির ধরন

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাই ভারতবর্ষের মধ্যে সব-চেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য, একথা পূর্বের সারণী হতেই জানা যায়। বস্তুতঃ 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলাই সব চেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ রাজ্য। সেই জন্য এইখানে ঘনবসতির প্যাটার্নটি দুইভাবে জানা বিশেষ দরকার।

প্রথম জানা দরকার, এই জনতা এখন কোথায় কি ভাবে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ জানা দরকার এই জনতা ক্রমে ক্রমে কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, দেড়শ বছর আগেও পশ্চিমবাংলায় জনতা প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন তার পরিব্যাপ্তির অসমানতা খুব বেশি। কোথায়ও অসম্ভব ঘনবসতি, কোথাও কম। এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আর্থিক বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনার সময় সে কথা আলোচ্য।

সুতরাং প্রথমে বর্তমান বিন্যাসের কথা আলোচনা করি। পূর্বেই বলেছি, এখানে জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ শহরবাসী। অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে —

	মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ শহরবাসী
সর্বভারত	১৭·৩
সমস্ত 'ক' শ্রেণীর রাজ্য	১৬·৫
উড়িষ্যা	৪·০৪
আসাম	৪·০
বিহার	৬·৭
মধ্যপ্রদেশ	১৩·৫
উত্তর প্রদেশ	১৩·৬
পঞ্জাব	১৮·৯
মাদ্রাজ (অবিভক্ত)	১৯·৬
পশ্চিমবাংলা	২৪·৮
বোম্বাই	৩১·০

এখানেও দেখা যাচ্ছে, বোম্বাই ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাতেই শহরবাসীর অনুপাত সর্বোচ্চ। পরে বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে এই শহরবাসীর উচ্চ অনুপাতের প্রকৃত তাৎপর্য কি। কিন্তু আপাততঃ যা দেখা যাচ্ছে তা হতে বোঝা যায়, পশ্চিমবাংলার চার আনা লোক শহরে, বার আনা লোক গ্রামে। সুতরাং শহরে ঘনতা কত আর শুধু গ্রামাঞ্চলে ঘনতা কত তার হিসাবটা এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

পশ্চিমবাংলায় প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
পশ্চিমবাংলা	মোট ঘনত্ব	৭৯৯	৫৬৯	৫১০	৪৩৮
	গ্রামাঞ্চল	৬১০	৪৮৫	৪৫২	৩৯৫
	শহরাঞ্চল	১৩,৬৩২	৬,২৬৬	৪,৪৬০	৩,৪১১
বর্ধমান বিভাগ	মোট	৭৮৬	৬১৩	৫৮৪	৫৩৯
	গ্রা	৬৮১	৫৬২	৫৫২	৫১৩
	শ	৯,০৩৭	৪,৫৮৩	৩,০৮৪	২,৫৪৮
বর্ধমান	মোট	৮১০	৫৮২	৫৬৫	৫৪৮
	গ্রা	৭০০	৫৪২	৫৪১	৫২১
	শ	৮,৩২৮	৩,৩৩৯	২,২৩০	২,৪৩৬
বীরভূম	মোট	৬১২	৫৪৪	৫২০	৪৯০
	গ্রা	৫৭৭	৫৩৬	৫২০	৪৮৯
	শ	৪,৭১৯	১,৪৫০	৬০৪	৬২৫
বাঁকুড়া	মোট	৪৯৮	৪২০	৪২২	৩৬৬
	গ্রা	৪৬৭	৩৯৮	৪০৫	৩৫২
	শ	৩,৮৭৮	২,৭৫৬	২,১৮৩	১,৮৮৪
মেদিনীপুর	মোট	৬৩৯	৫৩৩	৫৩১	৪৮৫
	গ্রা	৫৯৭	৫১১	৫১৭	৪৭১
	শ	৫,১০৯	২,৮০০	১,৮১৬	১,৮৮৬

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
হুগলী	মোট	১,২৮৬	৯২২	৮৬৮	৯৫৮
	গ্রা	১,০৭০	৭৭৫	৭৭৯	৮৯০
	শ	১,০১১৫	৫,৯৭০	৩,৯২৬	৩,২৯৭
হাওড়া	মোট	২,৮৭৭	১,৯৬২	১,৫১৯	১,০৬৪
	গ্রা	২,০০৪	১,৭৫২	১,২৪১	৯১৬
	শ	৩১,৪৬৫	১৫,৩৭৫	১০,৬১৮	৫,৮৯১
প্রেসিডেন্সী ডিভিসন	মোট	৮১০	৫৩৩	৪৪৯	৩৫৫
	গ্রা	৫৫০	৪২১	৩৬৮	২৯৫
	শ	১৬,৬২০	৭,৩৬০	৫,৩৫৫	৩,৯৭২
কলিকাতা	শ	৭৮,৮৫৮	৩৫,২৯৯	২৮,৪৯৪	২০,৭১২
নদীয়া	মোট	৭৫৯	৪৭৮	৫১২	৪৯৫
	গ্রা	৬৩৩	৪৩০	৪৬৯	৪৫০
	শ	৬,৯১৪	২,৮৫২	২,৬৪৭	২,৭০২
মুর্শিদাবাদ	মোট	৮২৮	৬৬১	৬৩৮	৫৮৬
	গ্রা	৭৭৩	৬২৫	৬০৯	৫৪৬
	শ	৫,০৫৩	৩,৪৩৯	২,৮৪৩	৩,৬২১
মালদহ	মোট	৬৭৪	৫১৮	৪৩৪	৩২৩
	গ্রা	৬৫০	৫০৫	৪২২	৩১১
	শ	১১,৩৪২	৬,৩৫০	৫,৬১৬	৫,৮৪৫
পঃ দিনাজপুর	মোট	৫২০	৩৭৮	৩২৯	২৯০
	গ্রা	৪৯২	...	...	...
	শ	৫৫,৯২	...	...	...
জলপাইগুড়ি	মোট	৩৮৫	৩১১	২২৯	৮৫
	গ্রা	৩৫৯	৩০৪	২২৬	৮২
	শ	৭,৬০৩	২,১৮০	১,১৮৩	৭৫৮

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
দার্জিলিং	মোট	৩৭১	২৬৬	২০৮	৭৯
	গ্রা	২৯৬	২৩৩	১৯২	৭৭
	শ	৭,৩৮১	৩,৫৯৭	১,৬৭১	২৪৭
কুচবিহার	মোট	৫০৭	৪৪৭	৪২৯	৪০৩
	গ্রা	৪৭১	৪৩৫	৪১৯	৩৯৯
	শ	১১,৬৭০	৪,১৯৩	৩,২৭০	১,৫৬২
২৪ পরগণা	মোট	৮১৭	৫১২	৫৮২	৩০১
	গ্রা	৫৯১	৪১৮	৩৩৩	২৭২
	শ	৯,২৩০	৪,০১৭	২,১৯৬	১,৫৭৭

এই দীর্ঘ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। এমন কি এই একটি হিসেব হতেই বাংলার বহু তথ্য বুঝতে পারা যায়। দুচারটির উল্লেখ করি। প্রথমেই দেখা যাক্ বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে (বর্তমান) প্রেসিডেন্সী বিভাগের তফাৎ। ১৮৭২ সালে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান বিভাগের মোট ঘনতা ছিল প্রতি বর্গ মাইলে ৫৩৯, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩৯, শহরাঞ্চলে ২৫৪৮। প্রেসিডেন্সী বিভাগে তখন তার চেয়ে অনেক কম ঘনতা। সেখানে ১৮৭২ সালে মোট ঘনতা মাত্র ৩৫৫, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২৯৫, শহরাঞ্চলে ৩,৯৭২। শহরের কথা আপাততঃ ছেড়ে দিচ্ছি। (এ অঞ্চলে বহু শহর তার পর ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে, শহরের চেহারাও বদলেছে)। গ্রামের কথাই ধরা যাক। বর্ধমান বিভাগে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা সে যুগে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১·৭ গুণ, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। পূর্বে বলেছি, পশ্চিমবাংলার মধ্যে বর্ধমান ও পশ্চিমদিকটাই বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, উত্তরদিক ও পূর্বদিক ততটা নয়— এ হিসেব তারই প্রমাণ দিচ্ছে। বিশেষতঃ মধ্য বাংলায় তখন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে, ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। সেই

সঙ্গে আর একটা পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। ১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালে বর্ধমানে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৫১৩ হতে মাত্র ৬৮১। সে তুলনায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে বৃদ্ধি হয়েছে অনেক বেশি— ২৭২ হতে ৫৯১। এর অর্থ কি? এর একটা ইঙ্গিত হল, বর্ধমান বিভাগে এত ঘন বসতি আগেই ছিল যে গ্রামাঞ্চলে আর বেশি লোক থাকার উপায় ছিল না— কিন্তু উত্তরবঙ্গ-সম্বলিত প্রেসিডেন্সী বিভাগে তা হয় নি। বিশেষতঃ চা-শিল্প, পাট, তামাক প্রভৃতির চাষ এ অঞ্চলে থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতেও অন্য জায়গার চেয়ে বেশি লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। জেলাগুলির অবস্থা আলোচনা করলে এই কথা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। দু-একটা উদাহরণ দিই। যেমন হুগলী জেলা। আশি বছর আগে ঘনতা গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৯০, এখন ১০৩০। খুব বেশি বাড়ে নি। আগেই তো খুব বেশি ছিল— তার উপর আর কত বাড়তে পারে? কাজেই অনেকে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে চলে এসেছে, তাই শহর বেড়েছে অনেক। বর্ধমান, বীরভূম, এ সবেরই চেহারা মোটামুটি তাই। কিন্তু মালদহের চেহারা তা নয়। সেখানে এই সময়ে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, অথচ সেখানে শহরের ঘনতাও মাত্র দ্বিগুণ হয়েছে, অন্য জায়গার মত ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হয়নি। অথবা জলপাইগুড়ি। গ্রামাঞ্চলের ঘনতা হয়েছে ৮২ থেকে ৩৫৯, অর্থাৎ চারগুণেরও বেশি! শহরও বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এরকম চাপবৃদ্ধি বর্ধমান বিভাগের উচ্চ-চাপ জেলাগুলিতে সম্ভব ছিল না। এমন কি শিল্প-প্রধান চব্বিশ-পরগণার কথাই ধরা যাক। এখানে শহরের প্রচুর বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের চাপও প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিয়েছে— যার ভগ্নাংশও বর্ধমান বা বীরভূমে সম্ভব হয়নি।

এই সব ঘটনা বস্তুত আকস্মিক নয়। আরও প্রমাণ আছে। সে কথা

অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনার সময় আলোচনীয়। এখন নানাকারণে এইভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এইরকম :

জেলার নাম	বর্গমাইল এলাকা	পঃ বঙ্গের মোট এলাকার %	জনসংখ্যা	পঃ বঙ্গের মোট জনসংখ্যার %
বর্ধমান	২৭১৫.৯	৮.৮২	২১,৯১,৬৬৭	৮.৮৩
বীরভূম	১৭৫৪.২	৫.৭০	১০,৬৬,৮৮৯	৪.৩০
বাঁকুড়া	২৬৫৭.৭	৮.৬৪	১৩,১৯,২৫৯	৫.৩২
মেদিনীপুর	৫২৫৮.৫	১৭.০৯	৩৩,৫৯,০০২	১৩.৫৪
হুগলী	১২০৯.২	৩.৯৩	১৫,৫৪,৩২০	৬.২৬
হাওড়া	৫৬৮.২	১.৮৫	১৬,১১,৩৭৩	৬.৫০
কলিকাতা	৩২.৩	...	২৫,৪৮,৬৭৭	১০.২৭
নদীয়া	১৫২৭.২	৪.৯৬	১১,৪৪,৯২৪	৪.৬১
মুর্শিদাবাদ	২০৯৪.৫	৬.৮১	১৭,১৫,৭৫৯	৬.৯২
মালদহ	১৪০৭.৯	৪.৫৭	৯,৩৭,৫৮০	৩.৭৮
পঃ দিনাজপুর	১৩৮৪.৮	৪.৫০	৭,২০,৫৭৩	২.৯০
জলপাইগুড়ি	২৩৭৮.৩	৭.৭৩	৯,১৪,৫৩৮	৩.৬৯
দার্জিলিং	১১৫৯.৭	৩.৭৭	৪,৪৫,২৬০	১.৭৯
কুচবিহার	১৩৩৪.১	৪.৩৩	৬,৭১,১৫৯	২.৭১
চব্বিশ পরগণা	৫২৯২.৮	১৭.২০	৪৬,০৯,৩০৯	১৮.৫৮

দেখা যাচ্ছে, শতকরা হিসেবে কতকগুলি জেলায় এলাকা ও জনবসতির মোটামুটি ভারসাম্য আছে। যেমন বর্ধমানের এলাকা ৮.৮২%, জনসংখ্যাও ৮.৮৩%। অথবা মুর্শিদাবাদ ৬.৮১/৬.৯২%। অনেক জেলায় এরকম ভারসাম্য নেই। যেমন কলিকাতা। এলাকা অতি সামান্য, জনসংখ্যা

অত্যন্ত বেশি। আবার উল্টো দিকও আছে। যেমন জলপাইগুড়ি এলাকায় ৭·৭৩% অথচ জনসংখ্যায় মাত্র ৩·৬৯%। এইভাবে জেলা-গুলিকে তিনটি ভাগ করা যেতে পারে। (১) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ কম ; (২) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি ; (৩) যেগুলিতে উভয় দিকের মোটামুটি ভারসাম্য আছে। সে হিসেবে প্রথম তালিকায় পড়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার। দ্বিতীয় তালিকায় পড়ে হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা নদীয়া, চব্বিশপরগণা। তৃতীয় তালিকায় পড়ে বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে কতকগুলি অঞ্চলে লোকের বাস বেশি। পূর্বে যে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে এ হিসেব মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় তালিকায় উল্লিখিত জেলাগুলির মোট ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা বাদ দিয়েও) ২৮৭৭ হতে ৭৫৯। অত চাপ প্রথম তালিকার কোথায়ও নেই। সেখানে অনুরূপ সর্বোচ্চ চাপ ৬৭৪ (মালদহ)।

থানাতেও এইরকম ব্যাপার আছে। সেন্সাস রিপোর্টে এই আলোচনা প্রসঙ্গে জিলাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) যে সব থানার জনসংখ্যার চাপ বর্গমাইলে ৭৫০ বা তদূর্ধ ; (২) আর যে সব থানায় চাপ তার চেয়ে কম। যেমন দেখা যায়, বর্ধমানে বর্গমাইল প্রতি ৩০০০ বা তদূর্ধ লোকসংখ্যা আছে এরকম এলাকা পশ্চিমবঙ্গের মোট ঐ ধরনের এলাকার মাত্র ২·৩৪%, কিন্তু ঐস্থানে বাস করে ২·৩৭ লক্ষ লোক, যা পশ্চিমবাংলার ঐ ধরনের ঘণবসতির মোট লোকসংখ্যার ১০·৮৫%। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐরকম ঘনবসতির এলাকাই নেই। এইভাবে দেখা যায়, জনবসতি পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত অসমান। এই প্রসঙ্গে সেন্সাস রিপোর্ট মন্তব্য করেছেন (১৭৯ পৃষ্ঠা) যে

পশ্চিমবাংলার মোট ৩০৭৭৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪১২৬ বর্গমাইল বা মাত্র ১৩·৪% ভাগে (মাত্র ১০৪টি থানা) জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ১০৫০ এর বেশি। এই এলাকাটুকুতে মোট জনসংখ্যার ৪২·৭% ভাগ লোক থাকে। পক্ষান্তরে বাকী ৮৬·৬% এলাকায় থাকে মোট জনসংখ্যার ৫৭·৩% লোক। অর্থাৎ শতকরা ৮৬·৬% জমিতে থাকে শতকরা ৫৭·৩% ভাগ লোক, অথচ কেবল বাকী শতকরা ১৩·৪% ভাগ জমিতে থাকে ৪২·৭% ভাগ লোক। এই হতেই জনবসতির অসমানতা স্পষ্ট হয়।

অসমান জনবসতির কারণ কি

জনবসতির ঘনতা বহু কারণের উপর নির্ভর করে। বসবাসের সুবিধা, স্বাস্থ্য, জীবিকার উপায়— ইত্যাদি বহুবিধ কারণ তার জন্য দায়ী। পশ্চিমবাংলায় এসবের মধ্যে জীবিকার সুবিধা-অসুবিধাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় কারণ। সেন্সাস রিপোর্টে (১৩৯ পৃষ্ঠায়) মন্তব্য করা হয়েছে —

> The general distribution of population has thus been far from uniform. But it has had one striking and uniform trend : wherever a new prospect of livelihood and sustenance has appeared that area has rapidly filled up, no matter whether the Sustenance has been from industry and agriculture. On the other hand, wherever no new industry has grown up or agriculture has attained a static stage and marginal land does not invite cultivation,

population has tended to stagnate, neither growing up naturally nor attracting immigrants.

এই দিক থেকে দেখা যায়, কতকগুলি জেলায় স্বভাবতঃই জনসংখ্যার চাপ খুব বেড়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জলপাইগুড়ির ঘনতা ১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ৮৫ থেকে ৩৮৫ হয়ে গিয়েছে— সাড়ে চারগুণেরও বেশি। তার কারণ চা-বাগানের বৃদ্ধি। বর্ধমানে জনসংখ্যার চাপ আগে থেকেই বেশি ছিল বলে চাপ ততটা বাড়েনি বটে, কিন্তু শুধু আসানসোল মহকুমা ধরলে দেখা যায় ১৮৭২ সালে সেখানে ঘনতা ছিল ৩৮২, আর এখন ১২৩৩! অর্থাৎ, চারগুণ!

পক্ষান্তরে দেখা যায়, অন্য এলাকাগুলিতে অবনতি ঘটছে। সেন্‌সাস রিপোর্ট হতে জানা যায় যে পশ্চিমবাংলায় কালনা, সোণামুখী, পাত্রসায়র, খড়ার, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, আরামবাগ, গোবরডাঙ্গা, বীরনগর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, পুরোনো মালদহ— এই তেরটি শহরের জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনায় এখন কম। এ ছাড়া আরও ১২টি শহর আছে (যথা, কাটোয়া, দাঁইহাট, সিউড়ী, ঘাটাল, চুঁচড়া, বারাসত, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, বহরমপুর, জঙ্গীপুর) যেখানে ১৮৭২ সাল হতে জনসংখ্যা কেবলই কমছিল, অতি সম্প্রতি (প্রধানতঃ গত যুদ্ধের সময় বা তার পর) কিছু বেড়েছে। এইরকম জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ অবশ্যই নানাবিধ। যেমন, যতদিন নদীপথে মাল চলাচল হত ততদিন কাটোয়ার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল— রেলপথ খোলার পর হতে সে গুরুত্ব কমে যায়। বীরনগরের ম্যালেরিয়া বিখ্যাত। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় এই সব শহর— আর এর মধ্যে অনেকগুলি প্রধান প্রধান জেলা শহরও আছে— ক্রমশঃ ক্ষয় পাওয়ার কারণ হল আর্থিক

অধোগতি। তাঁতশিল্পের অবনতি যে কৃষ্ণনগর শান্তিপুরের অবনতির প্রধানতম কারণ একথা সুবিদিত। তেমনি কাঁসার কাজের অবনতি হওয়ায় রামজীবনপুরের অবনতি হয়েছে। আরামবাগে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি এবং নদীর ক্রমাবনতির সঙ্গে শিল্পের অবনতিও যে তার অধোগতির অন্যতম কারণ, তা অস্বীকার করা যার না। সেইজন্য সেন্সাস রিপোর্টে ঠিকই মন্তব্য করা হয়েছে these police stations of low density and residential towns are a truer index of the fortunes of the people of West Bengal.

আর এক দিক্ দিয়ে আলোচনা করলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে বাধ্য হই। সেটা হল লোক-চলাচলের গতি প্রকৃতি। লোকে একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় গিয়ে থাকে নানা কারণে। হয়তো দুদিনের জন্য বেড়াতে যায়, হয়তো দু'মাস আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকে, হয়তো বা জীবিকার খোঁজে স্থায়ীভাবে গিয়ে অন্যত্র বসবাস করে। যদি দীর্ঘদিন ধরে লোক চলাচলের হিসেব নেওয়া যায় তাহলে সাময়িক কারণগুলোর উর্ধ্বে যে একটা স্থায়ী এবং গভীর লোকচলাচল হয় তার বেশ সুস্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে। সেই সুদূর ১৮৭২ সালে যখন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট কিছুই এরকম দেখা যায়নি, সে সময়ও হাণ্টারের বিবরণী হতে দেখা যায় বাঁকুড়া হতে লোকে আসাম যেতে আরম্ভ করেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ হল বাঁকুড়ার জমির অনুর্বরতা এবং সে কারণে জীবিকার সংকট। এবিষয়ে সেন্সাস রিপোর্টে একটি আশ্চর্য হিসাব আছে—

গ্রামাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা এবং জনসংখ্যার প্রতি ১০০ লোকের শতকরা কত লোক কৃষিনির্ভর তার অনুপাত

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত
পশ্চিম বাংলা	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১	৪৫২	৬০৭
বর্ধমান বিভাগ	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭১৮	৫৬৩	৭১৩	৫৫২	৬৩৪
বর্ধমান	৭০০	৬২৬	৫০২	৬৮০	৫৪০	৬৭১	৫৪১	৫৮৫
বীরভূম	৫৭৭	৮১৪	৪৭৯	৭৬৪	৫৩৯	৭৬২	৫২০	৬৮১
বাঁকুড়া	৪৬৭	৮১৮	৩৬৬	৭৭০	৪১২	৭৩৮	৪০৫	৬০২
মেদিনীপুর	৫৯৭	৮১৮	৪৯৪	৮৪০	৫২৩	৮১২	৫১৭	৭৬৭
হুগলী	১০৩০	৫৬৮	৭৬৭	৬১৩	৭৯৯	৬৪১	৭৭৯	৫২৮
হাওড়া	২০০৪	৩১৪	১৪৩৩	৪৬৬	১৩৬৫	৪৯১	১২৪১	৪০৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৫০	৪৯০	৩৯৪	৬৫০	৩৯৯	৬২৯	৩৬৮	৫৭৭
২৪ পরগণা	৫৯১	৫৩৪	৩৮৮	৬৭৪	৩৭০	৬৯০	৩৩৩	৬৩৮
নদীয়া	৬৩৩	৫৩৪	৪২৭	৬৭২	৪৭১	৬৬০	৪৬৯	৫৫০
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩	৬৯২	৫৫৬	৮২৪	৬১৭	৭০৭	৬০৯	৫৭০
মালদহ	৬৫০	৭১২	৪৮২	৭৬৫	৪৯০	৬৫৮	৪২২	৬৮১
পঃ দিনাজপুর	৪৯২	৮৫২	৩৫৪	৯১২	৩৬৮	৯১১	৩২৯	৮৭১
জলপাইগুড়ি	৩৫৯	৪৮৭	২৮৭	৭১৪	৭৭৫	২২০	২২৬	৭৪৭
দার্জিলিঙং	২৯৬	৩২১	২১৪	৪২৩	২০৩	৪৩৬	১৯২	৪১৮
কুচবিহার	৪৭১	৮৩৫	৪৩৬	৮৮৬	৪৩৮	৮৭৩	৪১৯	৮৬৪

এই হিসাবের তাৎপর্য কি? দেখা যাচ্ছে, যেমন বর্ধমান জেলায় প্রথম দিকে ঘনতাও বাড়ছে অনুপাতও বাড়ছে। যেমন ১৯০১ হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার যে চাপ বাড়ছে তারা কৃষিতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে, তাই কৃষিনির্ভরতার অনুপাতও বাড়ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেই একটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তারপর ঘনতা বাড়ছে বটে, কিন্তু কৃষিনির্ভরতার অনুপাত কমছে। অর্থাৎ বর্ধিত জনতা আর কৃষিতে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন বর্ধমানে ১৯২১ সালে ঘনতা ছিল

৫০২ আর অনুপাত ছিল ৬৮০। ১৯৫১ সালে দেখা গেল, ঘনতা হয়েছে ৭০০, অনুপাত কমে হয়েছে ৬২৬। মনে রাখতে হবে এ কেবল গ্রামাঞ্চলেরই ঘনতা। তেমনি, মেদিনীপুরে, নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদে মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, জলপাইগুড়িতে এবং কুচবিহারে ১৯২১ সালের পর থেকেই অনুপাত কমছে। কতকগুলি জেলায় তো ১৯১১ সাল হতেই অনুপাত কমতে শুরু হয়েছে— যথা হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ-পরগনা এবং দার্জিলিং। কেবল বীরভূম ও বাঁকুড়ায় এখনও কমে নি। বস্তুতঃ হুগলী হাওড়া এবং চব্বিশপরগনায় (সে হিসেবে বর্ধমানেও,কেননা ১৯১১ সাল ও ১৯২১ সালের অনুপাত খুব তফাৎ নয়) ১৯১১ সালেই জীবিকা হিসেবে কৃষিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে এই সংকট অবিসম্বাদিত ভাবে দেখা দিয়েছে ১৯২১ সালে। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় এখনও অনুপাত বাড়ছে তার কারণ সেখানে জমির অনুর্বরতার জন্য মোট চাপ এমনিতেই কম আছে। যাইহোক, মোটের উপর বলা যায় যে ১৯২১ সাল হতেই বাংলায় এই সংকট দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে লোকে জীবিকা পাক আর নাই পাক, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সেন্সাস্ রিপোর্টের ভাষায় The stage has already been reached when agriculture cannot entertain larger populations but must drive away some of the surplus. But the population driven away to towns by agricultural overcrowding leads a pillar to post existence and aggravates submarginal living.

এর ফলে লোক যাতায়াতেরও একটা সুস্পষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তা হতে দুটি জিনিস নজরে পড়ে। প্রথম, পূর্বের তুলনায় লোকচলাচল কমেছে। অর্থাৎ অন্যত্র গেলেই যখন জীবিকা মেলে না তখন লোকে

যাবে কেন ? দ্বিতীয়, এই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চলাচল এখনও আছে তার গতি প্রধানতঃ হুগলী হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার অভিমুখে। বিশেষ করে হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার দিকে। এর কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। এইখানে জীবিকার তবু কিছুটা সম্ভাবনা আছে, তাই এই যাত্রা। কিন্তু তা-ও ক্রমশঃ কমে আসছে। হুগলী ও হাওড়ায় তা বেশ কমেছে। এ হতে বোঝা যায় এখানেও জীবিকার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমবাংলার অসমান জনবসতির কারণ এই পটভূমিকায় সহজেই বোঝা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক বিন্যাস

এ হতেই পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বিন্যাসের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। বিভিন্ন জীবিকায় কত লোক আছে প্রথমেই তার একটা তুলনামূলক হিসেব নেওয়া যেতে পারে। সেন্সাসে জীবিকাগুলিকে প্রথম বড় দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কৃষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকা। কৃষির মধ্যে চারটি ভাগ—(১) যারা প্রধানতঃ নিজের জমি চাষ করে (২) যারা প্রধানতঃ অপরের জমি চাষ করে (৩) মজুর ও দিন শ্রমিক এবং (৪) মালিক এবং উপস্বত্বভোগী। তেমনি কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকার মধ্যেও চারটি ভাগ—(৫) কৃষি-ব্যতীত উৎপাদন অর্থাৎ শিল্প (৬) বাণিজ্য (৭) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৮) চাকরী ও বিবিধ।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জীবিকার গুরুত্ব বিভিন্ন রকম; তা অপর পৃষ্ঠার হিসেব হতে বোঝা যাবে।

বিভিন্ন প্রদেশের তুলনা হতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়—

(১) আপাততঃ মনে হয় কৃষি-নির্ভরতার পরিমাণ পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে কম, বোম্বায়ের চেয়েও কম। কারণ কৃষি নির্ভরতার অনুপাত পশ্চিমবাংলায় ৫৭·২১%, বোম্বায়ে ৬১·৪৬%

(২) আপাততঃ আরও মনে হয়, শিল্প নির্ভরতার অনুপাত পশ্চিমবাংলাতেই সবচেয়ে বেশি ১৫·৩৬%।

এ হতে মনে হতে পারে, পশ্চিমবাংলা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব অগ্রসর। কিন্তু গভীরতর বিচারে দেখা যাবে তা মোটেই নয়, বরং ঠিক উল্টো।

জীবিকার প্যাটার্ন

মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কোন্ জীবিকায় নিযুক্ত

	সমস্ত রকম কৃষি-জীবিকা	১	২	৩	৪	সমস্ত রকম কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা	৫	৬	৭	৮
পশ্চিমবাংলা	৫৭·২১	৩২·৩৪	১২·০১	১২·২৬	০·৬০	৪২·৭৯	১৫·৩৬	৯·৩২	৩·০৫	১৫·০৬
আসাম	৭৩·৩৪	৫৭·৮৯	১২·৮১	১·৭৪	০·৯০	২৬·৬৬	১৪·৬৪	৩·৯০	১·২৮	৬·৮০
বিহার	৮৬·০৪	৫৫·২৯	৮·২৭	২১·৮৭	০·৬১	১৩·৯৬	৩·৯৪	৩·৪০	০·৭২	৫·৯০
বোম্বাই	৬১·৪৬	৪০·৭৪	৯·৬৯	৯·০৫	১·৯৮	৩৮·৫৪	১৩·৭৬	৭·৬১	২·২৩	১৪·৯৪
মধ্যপ্রদেশ	৭৬·০০	৪৯·৫০	৪·৪৭	২০·৪১	১·৬২	২৪·০০	১০·৬৯	৪·৩৯	১·৪৭	৭·৫৪
মাদ্রাজ	৬৪·৯৩	৩৪·৯৫	৯·৫৮	১৮·২৩	২·১৭	৩৫·০৭	১২·৩৫	৬·৬৯	১·৬৮	১৪·৩৫
উড়িষ্যা	৭৯·২৮	৫৯·৫৩	৫·৯৪	১২·৩১	১·৫০	২০·৭২	৬·৩৩	২·৯১	০·৫০	১০·৯৫
উত্তর প্রদেশ	৭৪·১৯	৬২·২৭	৫·১৫	৫·৭১	১·০৬	২৫·৮১	৮·৩৮	৫·০৩	১·৩৬	১১·০৪

কৃষি-সংক্রান্ত জীবিকা

পূর্বে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা হতে একটা জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মোট কৃষি-নির্ভরতা পশ্চিমবাংলায় কম বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিজের জমি চাষ করে এমন লোকের অনুপাতও পশ্চিমবাংলায় কম। অন্য প্রদেশের তুলনায় অপরের জমি চাষ করে, বা দিনমজুরী করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি। ১নং জীবিকায় পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৩২.৩৪%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা ৬২.২৭%। অন্যান্য প্রদেশেও বেশি। পক্ষান্তরে দিনমজুরের অনুপাত পশ্চিমবাংলায় ১২.২৬% অথচ উত্তরপ্রদেশে তা মোটে ৫.৭১%, আসামে ১.৭৪%, বোম্বায়ে ৯.০৫%। এ হতে বোঝা যায়, চাষ করলে কি হবে, চাষীর অবস্থা এখানে অনেক হীন ; জমির মালিক চাষী বেশি নেই।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমশঃই কমছে, পোষ্যবর্গের অনুপাত ক্রমেই বাড়ছে। কৃষির জীবিকাগুলিতে উপার্জনকারীর অনুপাত ছিল ১৯০১ সালে ১৯.৮%, ১৯১১ সালে ২৩.৪%, ১৯২১ সালে ২৩.৪%, ১৯৩১ সালে ১৮.৫%, ১৯৫১ সালে ১৪.৯%। দেখা যাচ্ছে ১৯২১ সালের পর হতেই অনুপাত কমছে, একজনের উপর ক্রমশঃই বেশি পরিমাণ লোকে নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে পূর্বে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা এবং কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাতের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা হতে দেখা যায় ১৯২১ সাল থেকেই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দ্রুত অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

তৃতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে ভূম্যধিকারী ও উপস্বত্বভোগীর অনুপাত কম— মাত্র ০.৬। আসামে তা ৩.৯, বোম্বায়ে তা ১.৯৮%, মাদ্রাজে তা ২.১৭%। এ হতে একটা জিনিস বোঝা যায় ; অবশ্য তার আরও

প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে, কিন্তু এ হতেও বোঝা যায় যে এখানে ভূমির মালিকানা অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুঞ্জীভূত। অল্প কয়েকজনের হতেই তা এসে জড় হয়েছে।

এর সঙ্গে বহু অর্থনৈতিক প্রমাণ আছে যা হতে কৃষির নিদারুণ সংকটের কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তার আলোচনা অবান্তর বলে সে আলোচনা করলাম না। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমেই চাষী জমির মালিকানা হারিয়ে ভাগচাষী বা দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে, জমির আয়তন ক্রমেই ছোট হচ্ছে— এসব লক্ষণ স্পষ্টতঃই কৃষির অবক্ষয়ের লক্ষণ। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ঋণভার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে তদন্ত হয়েছিল তা হতে জানা যায় যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীদেরও কেবল খাদ্যসংগ্রহের জন্যই প্রধানতঃ ঋণ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় জমি একেবারে বেচে দিতে হয়েছে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে কিভাবে এবং কি কারণে লোক চলে আসছে সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি— তাও গ্রামাঞ্চলের অবক্ষয়ের এবং কৃষি সম্পর্কিত জীবিকায় সংকটের প্রকৃষ্ট চিহ্ন।

কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা

কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকাতেও চিত্র উজ্জ্বল নয়। যদিচকৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার অগ্রগতি পশ্চিমবাংলাতেই মনে হয় খুব বেশি, কিন্তু ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে, এখানেও অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। তার বহু প্রমাণ আছে। দু চারটি উল্লেখ করছি :—

(১) সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, বহুকাল ধরে অনেকগুলি শিল্পে অবনতি ঘটছে। যেমন, পশ্চিমবাংলায় Plantation Industries গুলিতে ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে ২·৫৬ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, মাছধরায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯০১ সালে ৮০২৫৯,

অথচ ১৯৫১ সালে মাত্র ৪৮,৩৭২। কতকগুলি খাদ্যসংক্রান্ত শিল্পের অনুরূপ সংখ্যা ৩৫৫৬৭ এর জায়গায় এখন ১৫৫০৬। Processing of grains and pulsesএ ১৯০১ সালে ছিল ২০২৭৮০, ১৯৫১ সালে তা মাত্র ১১১৪১৩। কার্পাস শিল্পে ১৯০১ সালে নিযুক্ত উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৮৪৮৪, তা ১৯৫১ সালে ৭৬৬০৫। এইরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে।

(২) কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রেই এই অবনতি খুব বেশি প্রকট। কিন্তু তা বলে মনে করার হেতু নেই যে বৃহৎ শিল্পের খুব একটা অগ্রগতি হয়েছে। বৃহৎশিল্পে দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা হতেই তা বোঝা যায়। ১৯৩৯ তার সংখ্যা ছিল ৫৩২৮৩০, ক্রমে ১৯৪৫ সালে তা হয় ৭০২৮২১। তারপর হতে ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৫১ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪৮৩০৩। অথচ অন্যান্য প্রদেশ এদিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা বোঝা যাবে—

বৃহৎ শিল্পে দৈনিক নিয়োজিত লোকের সংখ্যা

	১৯৩৯	১৯৪৫	১৯৪৯	১৯৫১
পশ্চিম বাংলা	৫৩২৮৩০	৭০২৮২১	৬৬৫০০৮	৬৪৮৩০৩
বোম্বাই	৪৬৬০৪০	৭৩৫৭৭৪	৭৮৯৪৬৩	৮০৮০৯৩
বিহার	৯৫৯৮৮	১৬৮৪০৮	১৫৫৩৩৪	১৭৫৫৫৮
আসাম	৫২০০৩	৫৮০৭০	৬১১৩২	৬৮৬১৪
মধ্যপ্রদেশ	৬৪৪৯৪	১১০২৬৩	৯৬২৭৩	১১৫৯৭৮
মাদ্রাজ	১৯৭২৬৬	২৭৯১৭৬	৩২৩৯৫০	৪২২২৯১
উত্তরপ্রদেশ	১৫৯৭৩৮	২৭৬৪৬৮	২৩৩৮৩৭	২২৪৫৫১

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

(৩) যে পরিমাণ লোক কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় জীবনধারণ করে তার মধ্যে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমেই কমছে। অর্থাৎ একজন উপার্জনকারীকে আগে যতগুলি পোষ্য পুষতে হত এখন তার চেয়ে বেশি পুষতে হচ্ছে। সেন্‌সাস রিপোর্টে (পৃঃ ৫১৪) দেখা যায় ১৯০১ সালে প্রতি ১০০০০ লোকে কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৭৭০, এখন তা কমতে কমতে ১৯৫১ সালে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭১। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিহারী শ্রমিকেরা প্রায় তাদের পোষ্য আনে না। সুতরাং শুধু যদি বাঙালী শ্রমিকদের কথা ধরা যায় তাহলে সহজেই বোঝা যায় পোষ্যবর্গের চাপ অনেক বেশি বেড়েছে।

(৪) সেন্‌সাসে অপ্রধান জীবিকা বলে একটা কথা আছে। যে লোক কারখানায় কাজ করে সেইটেই তার প্রধান জীবিকা হলেও সে হয়তো দেশের জমি থেকেও কিছু পায়। সে ক্ষেত্রে শিল্প তার প্রধান জীবিকা, কৃষি তার অপ্রধান জীবিকা। দেখা যাচ্ছে, বর্ধমান বিভাগে সমস্ত কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীদের মধ্যে ১৯২১ সালে হাজারকরা মাত্র ৬ জন কৃষির উপর অপ্রধান জীবিকা হিসেবে অংশত নির্ভর করত। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাজার করা ৮৩ জন! অর্থাৎ শিল্প যাদের প্রধান জীবিকা তাদেরও আজ আবার পিছন ফিরে কৃষির উপর এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। এই হতেই আমাদের পশ্চাদ্‌গতি বোঝা যায়।

(৫) তাছাড়া আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক বেশির ভাগই বাঙালী নয়— সাময়িক আগত অবাঙালীই বেশি। কাজেই শুধু বাংলাদেশবাসী ধরলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও জীবিকার সংকট ভয়াবহ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকার বেকারদের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়েছিলেন তা হতে দেখা গিয়েছে যে বাঙালীরা মোট জনসংখ্যার যত

অংশ, মোট জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অংশ জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ কম, হিন্দীভাষীদের জনসংখ্যায় অনুপাতের তুলনায় জীবিকার অনুপাত ৩৫% বেশি, উড়িষ্যাবাসীদের ৭২% বেশি। সেইজন্য বেকার সমস্যা বাঙালীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কি কৃষিসংক্রান্ত জীবিকা, কি কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকা— সব দিকেই সংকট খুব গভীর।

বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত

কোনও দেশের লোকবিন্যাসের আলোচনায় জনসাধারণের বয়স ও স্ত্রী পুরুষের অনুপাতের গুরুত্ব আছে। প্রথমে বয়সের হিসাব দেখা যাক্। নীচের হিসাব হতে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার বয়সের বিন্যাস বোঝা যাবে—

কোন্ বয়সের লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ—পশ্চিমবাংলা

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
০-১৫ বছর	৩৭·৭	৩৭·৬	৩৬·৬	৩৭·২	৩৬·৪	৩৭·৫
১৫-৫৫ বছর	৫৩·১	৫৩·৩	৫৪ ২	৫৫·০	৫৪ ৬	৫৭·৪
৫৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	১০·২	৯·১	৯·২	৯·৮	৯·০	৫·১

দেখা যাচ্ছে ০-১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের অনুপাত বিশেষ কোনও বদল হয় নি। কিন্তু ১৫-৫৫ বছরে আগের দিকে বিশেষ বদল না হলেও ১৯৫১ সালে তা বেড়েছে— তেমনি ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের লোকের অনুপাত অনেক কমে গিয়েছে। এর কারণ কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শরণার্থী আগমনের জন্যই কি এরকম বদল ঘটল? কিন্তু তা নয়। কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে সরকার যে অনুসন্ধান কিছুকাল আগে করেছিলেন তা হতে জানা যায়, তাদের মধ্যে ০-১৫ বছর শতকরা ৩৬·৫%, ১৫-৫৫ বছর ৫৭·৫ ভাগ এবং ৫৫ বছর ও তদূর্ধ্ব ৫·৯%। কাজেই তাদের চেহারা মোটামুটি মোট জনসংখ্যারই মত, তাদের জন্য এতখানি বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কি পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছেলেরা এবং বুড়োরা মরে যাওয়ার ফলে এমন হয়েছে? সেন্সাস রিপোর্টের ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পশ্চিমবাংলায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ৪·৮৭ লাখ লোকের— অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ২%। যদি ধরা

যায় সব মৃত্যুই ঘটেছে সর্বোচ্চ বয়সে তাহলেও অনুপাত কমে ৯% থেকে বড় জোর কমে ৭% হতে পারত, তার চেয়ে কমত না। এক্ষেত্রে বহু অন্য প্রদেশাগতদের অবস্থানই এই বদলের প্রধান কারণ বলে অনুমিত হয়, কেননা কেবল কর্মক্ষম বয়সের লোকই কাজ করতে আসে, বয়স হলে দেশে ফিরে যায়।

পশ্চিমবাংলায় এখন প্রতি ১০০০ পুরুষে মাত্র ৮৫৯ জন স্ত্রীলোক আছে। অন্য প্রদেশাগত লোকের জন্যই এরকম ঘটেছে, কারণ যারা কিছুকালের জন্য কাজ করতে আসে তারা কচিৎ সপরিবারে আসে। সেইজন্য বহিরাগতদের বাদ দিয়ে যদি শুধু এই প্রদেশে যারা জন্মেছে তাদের হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯২০ জন স্ত্রীলোক আছে। (সেন্সাস রিপোর্ট ৩০৮ পৃষ্ঠা) আর শুধু বহিরাগতদের মধ্যে দেখা যায় প্রতি ১০০০ পুরুষে গ্রামাঞ্চলেও মাত্র ৪২৬ জন স্ত্রীলোক, শহরাঞ্চলে আরও কম, ৩৩৫ জন স্ত্রীলোক। পশ্চিম বাংলায় এখন ১'৩৩ কোটি পুরুষ এবং ১'১৪ কোটি স্ত্রীলোক।

জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং লোকবৃদ্ধি

আমাদের লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অভিযোগ অহরহ শোনা যায়। কথাটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় যত জন্ম মৃত্যুর রেজিস্টারী হয় তাহতে দেখা যায় এখানে জন্মের হার প্রতি হাজার লোকে ২০'৫, আর মৃত্যুর হার ১৮'৯। তাহলে বাঁচার হার হাজার করা মাত্র ১'৬। অন্য দেশের তুলনায় তা মোটেই বেশি নয়। কিন্তু সেন্সাস রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে আমাদের জন্মরেজিস্টারী খুব নিখুঁত নয়, সব জন্ম রেজিস্টারী হয় না। সেন্সাস রিপোর্টে সেইজন্য অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে হাজারকরা জন্মের হার

৪১ বা ৪২ এর কাছাকাছি হবে। তা হলে বাঁচার হার অনেক বেড়ে যায়, হাজারকরা ২২ বা ২৩ হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাতাত্ত্বিক ও সমাজ শাস্ত্রীদের মতে $\frac{\text{জন্মহার}}{\text{মৃত্যুহার}} \times ১০০$ হতে যে ফল বার হয় তাকে জন-সাধারণের biological health এর সূচী বলা যায়। এই সূচী বাড়লে বলা যায় জনসাধারণের biological health ভাল হচ্ছে, অর্থাৎ জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই সূচী সম্প্রতি বাড়ছে। ১৯০১-১০ সালে তা ছিল ১০১·৩, ১৯১১-২০ সালে ৯২·১, ১৯২১-৩০ সালে ১১১·২, ১৯৩১-৪০ সালে ১৩০·৭, ১৯৪১-৫০ সালে ১১৩·২। এ হতে অনুমান হয়, জনসংখ্যা বাড়বে।

বস্তুতঃ তা বাড়ছেও। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আগে আমাদের জন সংখ্যার একটা চক্রবৎ আবর্তন ছিল— একবার কমত একবার বাড়ত। এই কমার কারণ ছিল নানাবিধ— বেশির ভাগই অবশ্য দুর্ভিক্ষ বা মহামারী। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে এই চক্রবৎ আবর্তন বন্ধ হয়ে গিয়ে লোকসংখ্যা কেবলই বাড়ছে। তার উপর জন্মমৃত্যুহারের উল্লিখিত সূচী থেকে মনে হয় জনসংখ্যা বাড়বেই। সহজবুদ্ধিতেও একথা বোঝা যায়। আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলও ফলতে শুরু করছে। গত দশ বছরের মৃত্যুহার আলোচনা করলে দেখা যায় মৃত্যুহার ধীরে ধীরে কমছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জন্মহার কমছে না। বাস্তবিক তা কোনও দেশেই কমে না। লোকসংখ্যাতত্ত্বের একটি সাধারণ সত্য হল এই যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে ক্রমে ক্রমে জন্মহার কমে। কিন্তু সে কমে অনেক দেরীতে, সদ্য সদ্য কমে না। সেইজন্য মাঝে একটা সময় আসে যখন মৃত্যুহার কমে অথচ জন্মহার কমে না, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ নিয়ে অবশ্য

অনেক তর্ক আছে, কিন্তু সে সব তর্ক ছেড়ে দিয়েও বলা যায় আমরা মোটামুটি এইরকম অবস্থাতেই পৌঁছেছি এবং এখন কিছুকাল জনসংখ্যা বাড়বে এই কথাই ধরে নেওয়া উচিত।

কিন্তু এত সত্ত্বেও একথা কি বলা যায় যে আমাদের জনসংখ্যা খুবই বেশি বাড়ছে? সব দিক্ বিবেচনা করলে তা বলা যায় না। পশ্চিম-বাংলায় গত আশি বছরে জনসাধারণের নীট হ্রাসবৃদ্ধি এইরকম—১৮৭২ সাল হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নীট বৃদ্ধি ২০·৫%, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে নীট বৃদ্ধি ৫১·৩%। যদি কেবল ১৯০১ সাল হতে ১৯৫১ সাল ধরা যায় তাহলে নীট বৃদ্ধি ৫৬·৭%। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে প্রতি বছর মাত্র ১·১%। কেবল গত ত্রিশ বছরের হিসাবে গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধি ১·৭%। এ হার খুব বেশি নয়। ১৯৫১ সালে বহু শরণার্থীও আছে। তাদের বাদ দিলে দেখা যায় ১৯০১-৫১ সালের মোট বৃদ্ধি ৪৩·৪%, অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এরও কম। শরণার্থীদের বাদ দিয়ে ১৯৩১-৫১ সালের নীট বৃদ্ধি ২৮·৬% অর্থাৎ বাৎসরিক গড়-পড়তা বৃদ্ধি ০·৯৫% এর কাছাকাছি। কোনমতেই এ হার বেশি বলা যায় না। সেন্সাস রিপোর্টে উদ্ধৃত তথ্য থেকে জানা যায় ১৭৫০ হতে ১৯০০ এই দেড়শ বছরে জগতের লোকসংখ্যা বেড়েছে ১২১% অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় ·৮%। বিভিন্ন দেশের অনুরূপ গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধির হিসেব:— য়ুরোপ ১'২%, উত্তর আমেরিকা ৪০·৯! গ্রেট ব্রিটেনের হিসেব নিলে দেখা যায় ১৮০১ সাল হতে১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক কুড়ি বছরে শতকরা মোট বৃদ্ধি পেয়েছে এই রকম—১৮০১-২১ সালে ৩৪%, ১৮২১-৪১ সালে ৩২%, ১৮৪১-৬১ সালে ২৫%, ১৮৬১-৮১ সালে ২৮%, ১৮৮১-১৯০১ সালে ২৫%, ১৯০১-২১ সালে ১৬%, ১৯২১-৪১ সালে ৯%। অনেক সময়ই তা গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এর

বেশি, যদিচ ইদানীং তা কমে গিয়েছে। তা ছাড়া ফ্রান্স বাদ দিলে পশ্চিম য়ুরোপের অনেক দেশের জনবৃদ্ধির হারই এর চেয়ে বেশি। সুতরাং আমাদের দেশে বৃদ্ধিহার যে খুব বেশি এমন কথা মোটেই বলা যায় না। আসল কথা হচ্ছে আমাদের অর্থিক দুর্দশা এতই বেশি যে সামান্য বৃদ্ধিতেই আমাদের ত্রাহি ত্রাহি করতে হয় সেইজন্য ভোগ্ট (vogt) এর মতো নব-মালথুসীয়দের কথায় ভয় না পেয়ে আমাদের আসল নজর দিতে হবে আর্থিকসমস্যা সমাধানের। তার সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে দরকার নেই এমন কথা বলছি না— কিন্তু সেইটেই একমাত্র কথা নয়।

লোক-চলাচল ও বহিরাগত

পূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবাংলার মধ্যে লোকচলাচলের মোটামুটি চেহারা কি। তাতে দেখা গিয়েছে, সব চেয়ে বেশি লোক আসে শিল্পাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে। এখন লোক-চলাচলের কথাটা আর একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব, কেননা পশ্চিমবাংলায় বহিরাগতের সংখ্যা খুব বেশি। লোক-চলাচলকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রথমতঃ, এই প্রদেশের মধ্যেই একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোকের যাওয়া-আসা। এরই উল্লেখ পূর্বে করেছি। সাধারণতঃ জীবিকার চেষ্টায় শিল্পাঞ্চল অভিমুখেই এর গতি। কিন্তু তা ছাড়াও লোকচলাচল আছে। তার মধ্যে প্রথম হল, ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশ থেকে লোক পশ্চিমবাংলায় আসছে এবং পশ্চিমবাংলার লোক সেই সব প্রদেশে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে অনুরূপ যাওয়া-আসা।

এর মধ্যে প্রথমে এই প্রদেশের ভিতরের লোক যাওয়া-আসার হিসেবটি উদ্ধৃত করছি। মনে রাখতে হবে, এ হিসেব সবই এই প্রদেশের লোকের, বাইরের লোকের নয়।

	জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলার		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলায় গিয়েছে		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ নীট যাওয়া আসা— আসা (+), যাওয়া (−)	
	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১
বর্ধমান	৭˙০	৬˙৯	৫˙১	৪˙৯	+১˙৯	+২˙০
বীরভূম	৩˙১	৩˙০	১৩˙১	৪˙১	—১০˙০	—১১

	জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলার		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলায় গিয়েছে		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ নীট যাওয়া আসা— আসা (+), যাওয়া (−)	
বাঁকুড়া	৩·৮	১·৭	৭·১	১১·৯	—৩·৩	—১০·২
মেদিনীপুর	৩·৪	০·৯	৬·০	৫·৩	—২·৬	—৪·৪
হুগলী	৮·১	১১·৬	৭·৯	৭·৭	+০·২	+৩·৯
হাওড়া	৭·৬	৫·৩	৯·৫	৫·৩	—১·৯	...
২৪-পরগণা	৫·৫	৬·২	২·৯	৪·৩	+২·৬	+১·৯
কলিকাতা	১২·৩	৩০·৩	৫·৭	৪·৬	+৬·৬	+২৫·৭
নদীয়া	৩·৮	৩·২	৫·৮	৭·০	—২·০	—৩·৮
মুর্শিদাবাদ	২·৭	২·৯	৪·০	৭·২	—১·৩	—৪·৩
মালদহ	১·৬	৩·৯	৩·৩	২·২	—১·৭	+১·৭
পঃ দিনাজপুর	২·০	২·৫	১·৬	১·১	+০·৪	+১·৪
জলপাইগুড়ি	২·৯	৫·২	১·১	১·৭	+১·৮	+৩·৫
দার্জিলিং	১·৫	৩·০	২·৮	১·৮	—১·৩	+১·২
কুচবিহার	০·৫	৬·৩	২·৩	৪·২	—১·৮	+২·১

দেখা যাবে, বাঁকুড়া বা বীরভূমের মত অনুর্বর জেলা থেকে যাওয়ার পরিমাণই বেশি, আর বর্ধমান হুগলী চব্বিশ-পরগণা কলকাতা জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর (অর্থাৎ শিল্পাঞ্চল এবং চা-বাগান এলাকায়) যাওয়ার চেয়ে আসার পরিমাণ বেশি।

এরপর ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সঙ্গে আমাদের যাওয়া-আসার হিসেব দিচ্ছি—

	(হাজারে) ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে আসা	(হাজারে) ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাওয়া	(হাজারে) আসা যাওয়ার নীট হিসাব, আসা (+), যাওয়া (−)
পশ্চিমবাংলা	১৮৮১	৩১১	+১৫৭০
বর্ধমান	২৩৫	৩১	+ ২০৪
হুগলী	১০৯	২১	+ ৮৮
হাওড়া	১০৬	৬	+ ১০০
২৪ পরগণা	৩৫০	১৪	+ ৩৩৬
কলিকাতা	৬৭৭	৪৫	+ ৬৩২
জলপাইগুড়ি	১২২	৫	+ ১১৭

দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের অন্য অংশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছে ১৮.৮১ লক্ষ, গিয়েছে ৩.১১ লক্ষ, অর্থাৎ মোটের উপর ১৫.৭০ লক্ষ নীট এসেছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি জেলাতেই নীট এসেছে ১৪.৫৭ লক্ষ। এইটেই হল শিল্পাঞ্চল এবং জীবিকার প্রধানতম ক্ষেত্র।[১১] সেখানেই অন্য প্রদেশাগতের প্রাদুর্ভাব বেশি। পূর্বেই বলেছি এরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়, হতেও চায় না— কারণ এদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে ৫৩৭, শহরাঞ্চলে ৪৩৯, মোট ৪৫২ এর মধ্যে বিহার থেকে এসেছে ১১.০৯ লক্ষ, বিহারে গিয়েছে ১.৩৭ লক্ষ; উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে ২.৯৫ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে ০.৪৯ লক্ষ; উড়িষ্যা হতে এসেছে ২.০২ লক্ষ, উড়িষ্যায় গিয়েছে ০.৩৪ লক্ষ। এই তিনটি প্রদেশই প্রধান।

এইবার ভারতের বাইরের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে লোক যাওয়া-আসার

১১ এই প্রসঙ্গে ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'স্বাভাবিক' ও 'প্রকৃত' জনসংখ্যার হিসেব স্মরণীয়।

কথা বলব। এর মধ্যে একটি খুব বড় অংশ হল পাকিস্থান হতে আগত শরণার্থীরা। ১৯৫১ সালে তাদের হিসাব ছিল এইরকম—পশ্চিম-বাংলায় মোট ২০·৯৯ লক্ষ, তার মধ্যে বর্ধমানে ৯৬০০০, বীরভূমে ১২০০০, বাঁকুড়ায় ৯০০০, মেদিনীপুরে ৩৪০০০, হুগলীতে ৫১০০০, হাওড়ায় ৬১০০০, চব্বিশ-পরগণায় ৫ লক্ষ ২৭ হাজার, কলিকাতায় ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, নদীয়ায় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার, মুর্শিদাবাদে ৫৯০০০, পশ্চিম দিনাজপুরে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, জলপাইগুড়িতে ৯৯০০০, মালদহে ৬০০০০ দার্জিলিঙে ১৬০০০, কুচবিহারে ১ লক্ষ। দেখা যাবে চব্বিশ-পরগণা, কলিকাতা ও নদীয়াতেই উদ্বাস্তদের সবচেয়ে ঘন বসতি। এছাড়া শরণার্থী নয় এমন পাকিস্থানীর সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় ৫,১৯,৮৬৭।

নেপাল ও সিকিম থেকেও অনেক লোক আসে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাংলায় তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৫,৫৮৬। তার মধ্যে কলিকাতায় ১০,৮৩১, জলপাইগুড়িতে ২৬৮৬৩, দার্জিলিঙে ৪০,৪০৬ এবং কুচবিহারে ৯,০৯৭। এ ছাড়া জগতের অন্যান্য দেশ থেকে যে লোক আসে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়— পশ্চিমবাংলায় মোট ২৬,৭০৪। তার মধ্যে বিলেতের লোক হল মাত্র ৬,৮২৫।

সাক্ষরতা, ভাষা ও ধর্ম

এবারকার সেন্‌সাসে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪·৫% সাক্ষর। শুধু পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর ৩৪·৭%, শুধু স্ত্রীলোকদের ১২·৭%। কেবল গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ নিলে সাক্ষর ১৭·৭%, তাদের মধ্যে শুধু পুরুষ ২৮·১%, শুধু স্ত্রীলোক ৬·৭%। আর শুধু শহরাঞ্চলে জনসংখ্যায় ৪৫·২% সাক্ষর, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ৫১·৮% সাক্ষর শুধু স্ত্রীলোক ৩৫·১%। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের তুলনায় অবশ্য এ কিছুই

নয়, কারণ সেখানে অনুরূপ হিসেব হল মোট জনসংখ্যায় ৪৫·৮, শুধু পুরুষ ৫৪·৮%, শুধু স্ত্রীলোক ৩৭·০%, গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর ৪৪·৪%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ধরলে ৫৩·৮%, শুধু স্ত্রীলোক ধরলে ৩৬·০%। আর শহরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যায় ৫১·৩%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ৬০·০%, শুধু স্ত্রীলোক ৪২·৪%। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি কেবলমাত্র বোম্বাই। সেখানে মোট জনসংখ্যার ২৪·১% স্বাক্ষর, শুধু পুরুষদের মধ্যে ৩৪·৯% সাক্ষর, শুধু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১২·৬%। অন্যান্য রাজ্যে সাক্ষরতা অনেক কম। সবচেয়ে কম হল বিহারে, মাত্র ১১·৯%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ১৯·৯%, শুধু স্ত্রীলোক ৩·৮%। সেখানে গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা তো মাত্র ১·৫%।

কিন্তু এতে পশ্চিমবঙ্গের উল্লসিত হবার কোনও কারণ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধু সাক্ষরতার কথা বাদ দিয়ে যারা আরও কিছু লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথা ধরলে অবস্থা অন্য রকম দেখা যাবে। সকলেই জানেন এদেশে যারা একবার সাক্ষর হয় তাদের অনেকেও চর্চার অভাবে পরে নিরক্ষর হয়ে পড়ে— একথা বারবার শিক্ষাবিভাগের নানা রিপোর্টে স্বীকৃতও হয়েছে। তাছাড়া কোনরকমে কয়েকটা অক্ষর লিখতে পারলেই কাজ চালাবার মত ন্যূনতম বিদ্যা হয়েছে মনে করা অন্ততঃ আজকের দিনে জনায়ত্তরাষ্ট্রে ঠিক নয়। সেইজন্য যদি আর একটু লেখাপড়া জানাদের হিসেব ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, সারা পশ্চিমবাংলা অন্ধকার— কেবল যত আলো কলিকাতায়। যেমন মধ্য পরীক্ষা পাশ লোকের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট ৪১ লক্ষ ৪৩ হাজার তার মধ্যে ১৮·৭% কলিকাতায়। সাড়ে তিন লক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন পাশের ৩৭·৬% কলিকাতায়। ৫৯,৩৫৯ গ্রাজুয়েটের

মধ্যে কলিকাতায় ৫২·৫%। এম-এ বা এম-এস্ সি-পাশকরা লোকের মধ্যে ৫৯·৮% কলিকাতায়। ডাক্তারী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ১৬,১৫৫ লোকের মধ্যে কলিকাতায় ৬,৫৮৮ (পুরুষ ৬,২৩৪ স্ত্রীলোক ৩৫৪) অর্থাৎ ৪০·৮%। বিলেতের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ৭৯·৫% কলিকাতায়। আর অধিক লেখার প্রয়োজন নেই। এ হতেই বোঝা যায় বিদ্যার আলো কলিকাতাতেই উজ্জ্বল, বাকী জায়গায় বড় বেশি অন্ধকার।

পরিশেষে ভাষার কথা উল্লেখ করে পরিসমাপ্তি করি। আমাদের দেশে ভাষার শেষ নেই, পশ্চিমবাংলাতেও ভাষাবৈচিত্র্য বড় কম নয়। ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসে মোট ১১৬টি ভাষার হিসেব পাওয়া যায়। তার মধ্যে দেশবিদেশের নানা ভাষা আছে। তার মধ্যে ভারতের ভাষা মোট জনসংখ্যার ৯৮·৬২% লোকে বলে। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা মাতৃভাষা শতকরা ৮৪·৬২%, হিন্দী মাতৃভাষা ৬·৩৫% সাঁওতালি ২·৬৭% উর্দ্দু ১·৮৪, নেপালি ০·৭%। ইংরেজী মাতৃভাষা ০·১৫%। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করে এমন লোকের সংখ্যা অনেক।

এই প্রসঙ্গে ধর্মের কথাটাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার ৭৮·৪৫% হিন্দু, ১৯·৮৫% মুসলমান, ০·৭০% খৃস্টান, ০·১২% শিখ। তা ছাড়া আরও ধর্ম আছে যা সংখ্যায় বেশি নয়।

কথাশেষ

সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার পরিসরে পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি কথা মাত্র উল্লেখ করা সম্ভব হল। বস্তুতঃ এই আলোচনা অতি বিরাট এবং অতি বিচিত্র। বিশেষতঃ ১৯৫১ সালের পশ্চিমবাংলার সেন্সাস রিপোর্ট এক অসামান্য কীর্তি, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার সম্বন্ধে কত যে জিনিস কত যে আলোচনা একত্রিত আছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া ইতিহাসের দিক্ দিয়েও বাংলাদেশ বড় বিচিত্র। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়ের মেখলার মধ্যে নদীমাতৃক এই সমতল শ্যামল বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল— তার মানুষের চেহারা, তার ভাষা, তার সমাজ, তার জীবনযাত্রা— সবই একটু আলাদা। তার মধ্যে ধীরে ধীরে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কিভাবে গ্রাম বদলাচ্ছে শহর বদলাচ্ছে, পুরোনো যে সব শহর একদা পল্লীবাংলার সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল সেসব কেমন করে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে, নতুন চেহারার শহর গড়ে উঠছে অন্য জায়গায়, তার পিছনে জাগছে অন্য ধরণের প্রেরণা, কলকাতা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, সারা দেশের বিদ্যার আলো সেখানেই, অথচ পল্লীবাংলা সে আলো হতে বহুলাংশে বঞ্চিত— এ সব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলে বাংলার এক বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে। তার উপর বঙ্গবিভাগ হওয়ায় তো বাংলার চেহারাই বদলে গিয়েছে। শিল্প ও কৃষি, শহর ও গ্রাম, রাঢ়ের রুক্ষতা ও 'বঙ্গে'র সরস শ্যামলতা— এই দুই মিলিয়েই তো বাংলাদেশ ছিল। এখন তার সে চেহারাই নেই। এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনা চলুক, কারণ পশ্চিমবাংলাকে প্রকৃতভাবে বোঝবার জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ

২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়

৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক